Ei Aami Renu by Somoresh Majumdar

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে সুমিত থমকে দাঁড়াল। দরজা ভেজানো, তালা খোলা। অথচ ওর স্পষ্ট মনে আছে বেরুবার সময় ও ঠিকঠাক তালা লাগিয়েছিল। ওদের এই মেসের বাসিন্দারা একটু অন্য ধরনের, কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না, প্রত্যেকেই ভাল চাকরি করে, চুরিটুরি কোনওকালেই হয়নি। কেউ যে ইয়ার্কি করে তালা খুলবে এমন নয়।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চমকে উঠল সুমিত। সারা ঘর তছনছ করে গেছে কেউ, জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো। এমনকী ওর সুটকেসের ডালা খোলা, জামা-প্যান্ট বিছানার ওপর স্তূপ করে রাখা। টেবিলে দামি ঘড়িটা ঠিক আছে, একটা সেফার্স কলম ছিল সেটাও আছে। মাথার বালিশের নীচে একটা মোটা খামে তিনশো টাকা ছিল, সুমিত দেখল, যে এসেছিল সে টাকাগুলো স্পর্শ করেনি।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুমিত চেঁচিয়ে ওদের চাকরকে ডাকল। লোকটা অনেক দিনের পুরনো, হলফ করে বলল কাউকে আসতে দ্যাখেনি। আজ রবিবার, সব বাবুরা মেসেই আছেন, কেউ এলে নিশ্চয়ই জানা যেত। সুমিতের ঘর তিনতলায় ছাদের ওপর। সিঁড়ি দিয়ে অচেনা লোক এলে ঠাকুর-চাকর কেউ না কেউ দেখত।

অথচ বোঝাই যাচ্ছে কেউ ওর ঘরে এসেছিল। বাইরে থেকে যদি না আসে, তা হলে এই মেসেরই কেউ। সেটা ভাবতে সুমিতের কষ্ট হচ্ছে। জিনিসপত্রগুলো গোছাতে গিয়ে ও দেখল কিছুই নিয়ে যায়নি লোকটা। তা হলে কেন এসেছিল? সুমিত কেমন নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিল।

ওর জানালা দিয়ে সামনের ট্রাম রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। এখন সন্ধে হয়ে গেছে, রাস্তায় লোকজন এদিকটায় কম। সুমিত দেখল একটা খারাপ ট্রাম আলো নিভিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। আর ঠিক ট্রামটা চলে যেতেই ও দেখতে পেল সামনের সিগারেটের দোকানের পাশে ঝোলানো দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে একটা গুন্ডা মতো লোক ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে জানলার সামনে থেকে সরে এল সুমিত, তারপর যাতে ওকে না দেখতে পায় এমনভাবে লক্ষ করতে লাগল। লোকটাকে আগে কখনও দ্যাখেনি সে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকে। এক সময় সিগারেটওয়ালাকে কী জিজ্ঞাসা করল কী করল, সেটা অবশ্য ইচ্ছা করলেই জানতে পারে সুমিত। রোজ তিন প্যাকেট ফিল্টার উইলস কেনে ও লোকটার কাছ থেকে, মহাবীর না কী যেন নাম। সিগারেট ধরিয়ে লোকটা পাশের রকে গিয়ে উঁচু হয়ে বসল। অনেকটা শকুনের মতো, টাক মাথাটা ওপর দিকে তোলা।

এই লোকটাই কি ওর ঘরে এসেছিল? সুমিত ওর ঘরে পায়চারি করল খানিক। হঠাৎ ওর মনে পড়ল কাল অফিসে একটা টেলিফোন এসেছিল। ও তখন ডিরেক্টরের ঘরে। ফিরে এসে শুনল যে টেলিফোন করেছিল সে তার নাম বলেনি। মেয়েলি গলা। শুনে একটু অবাক হয়েছিল ও। মহিলাদের সঙ্গে ইদানীং ওর যোগাযোগ নেই। আগে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সবার মতো ওরও কিছু মেয়ে বন্ধু ছিল। তারা, যেমন হয়, আর যোগাযোগ রাখেনি। ঠিক তখন ওর বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে সিগারেট ধরিয়েছিল সুমিত। যাঃ, হতেই পারে না। যে টেলিফোন ধরেছিল তাকে গলাটা কেমন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। বুকের মধ্যে কিছু একটা তির তির করে কাঁপুনি ধরাচ্ছিল।

লোকটা এখনও বসে আছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। রাস্তায় লোকজন কম। কেউ একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে—এটা কতক্ষণ সহ্য করা যায়। তা ছাড়া লোকটা বেশ রোগা পটকা, ইচ্ছে করলেই সুমিত ওকে কাবু করতে পারে। দরজা বন্ধ করে ও নীচে নেমে এল।

আকাশে একটু মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সুমিত ট্রাম লাইন পেরিয়ে সিগারেটের দোকানের কাছে এল। লোকটা তখনও ওর ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে করেই ঘরের আলো নেবায়নি সুমিত। প্রায় পাশে এসে ভাল করে লোকটাকে দেখল ও। এক একটা লোক থাকে যাকে দেখলেই গিরগিটির কথা মনে পড়ে, প্যান্ট বা ধুতি কোনওটাতেই তাদের মানায় না। এই সময়

লোকটার নজর পড়ল ওর দিকে। চমকে উঠে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। বাঁ হাতের তর্জনী তুলে ওকে ডাকল সুমিত। একটা শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। না, কোনওকালে একে দেখেনি সুমিত। এরকম চেহারা কোনওকালে ভোলা যায় না।

'কী চাই?'

হাসল লোকটা। গা রি-রি করে উঠল সুমিতের। হাসির সময় কালো মাড়ি দেখা একদম সহ্য হয় না আর ওর।

'আসুন স্যার, একটু চা—।' ঘাড় বেঁকিয়ে সুমিতের দিকে একটু হেসে আঙুল দিয়ে ওপাশের চায়ের দোকান দেখাল। লোকটা এর মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে, সুমিত অবাক হয়ে দেখল।

'আমার ঘরে আপনি গিয়েছিলেন?' সুমিতের ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটার জামার কলার আঁকড়ে ধরে। সুপুরি গাছের মতো মাথা দোলাল লোকটা, 'নেভার, নেভার। আমি স্যার বেলা তিনটে থেকে এখানে বসে আছি, বিশ্বাস না হয় ওই সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করুন। ও-সবের মধ্যে আমি নেই। কী যে বলেন স্যার!' তারপর হঠাৎ চুপ করে ওর ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আলোটা জ্বেলে এসে আমাকে ভড়কে দিয়েছিলেন মাইরি। আসুন স্যার একটু চা খাই, পাঁচ ঘণ্টা চা খাইনি, খেতে খেতে কথা বলি।' সুড়ুৎ করে রাস্তা পেরিয়ে গেল লোকটা, গিয়ে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল।

দারুণ অবাক হল সুমিত। লোকটা একটুও অপেক্ষা করল না চা খেতে ওর আগ্রহ আছে কি না জানার জন্য। চায়ের দোকানটা এখন খালি হয়ে এসেছে। চা খেতে ওর কোনও সময়ই আপত্তি নেই, কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে খাবে কেন? প্রথম কথা লোকটাকে সে চেনে না, তার ওপর এর চাল-চলন সন্দেহজনক। বিনা কারণে ও চা খেতে বলবেই বা কেন? ও যদি তিনটে থেকে এখানে বসে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই দেখেছে কেউ ওর ঘরে এসেছিল। সুমিত সিগারেটওয়ালার সামনে গিয়ে আঙুল দিয়ে লোকটাকে দেখাল, 'এই লোকটা এখানে কতক্ষণ আছে তুমি জানো?' মুখ বাড়িয়ে মহাবীর না কী যেন নাম, লোকটাকে দেখল, 'হাঁ সাব, সামকো আগেসে ইঁহা বৈঠা হ্যায়, সি আই ডি হোগা সাইদ, কাঁহাভি নেহি গিয়া আউর আপকো বাত পুছা।' সুমিত দেখল লোকটা মাথা নেড়ে তাকে ডাকছে।

শেষ পর্যন্ত একটা কৌতূহল ওকে চায়ের দোকানে নিয়ে এল। কোনার দিকের একটা টেবিলে বসেছিল লোকটা। পাসিং-শোর একটা প্যাকেট দিয়ে টেবিল ঠুকছিল। কৌতুক বোধ করল সুমিত। আজকাল পাসিং-শোর প্যাকেট হাতে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। সুমিতকে দেখেই লোকটা বলল, 'বিশ্বাস হল স্যার?' তারপর চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল, 'এই লাইনে পঁচিশ বছর কাজ করেছি মিথ্যা জিনিসটা আমার মধ্যে পাবেন না একদম।'

সুমিত চেয়ার টেনে বসতেই লোকটা বলল, 'দেশলাই আছে স্যার?' যেন তার কাছে দেশলাই আছে কি না জানবার জন্যই তাকে ডাকা। পকেটে থাকা সত্ত্বেও সুমিত বলল, 'না।' লোকটা বয়কে ডাকল, দেশলাই চেয়ে নিয়ে দু কাপ চা দিতে বলল। সুমিত বলল, 'এক কাপ দিতে বলুন।'

চোখ ছোট ছোট করে তাকাল লোকটা, 'মানে? আপনি খাবেন না? সেকী! আপনার তো চায়ে অরুচি নেই। কাল সারাদিনে সাত কাপ চা খেয়েছেন। মেসে দু কাপ বাইরে পাঁচ কাপ। তার মধ্যে অফিসে তিন কাপ, আর দুই কাপ চৌরঙ্গিতে আপনাদের আড্ডায়। যাঃ, চা খাবেন না তা কি হয়!' মাড়ি বের করে হাসল লোকটা।

হতভম্ব হয়ে গেল সুমিত। সত্যিই তো কাল বেশি চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এটা তো তার খেয়াল হয়নি। এই লোকটা এ-সব জানল কী করে? তার মানে নিশ্চয়ই ও পেছন পেছন ঘুরেছে কালকে। অথচ একে একবারও দ্যাখেনি সুমিত।

'কী বলতে চান বলুন।' গম্ভীর হল সুমিত।

হাসল লোকটা, 'বসুন না, চা আসুক।'

'আপনাকে আমি কিন্তু চিনি না।' কথা বলতে চাইল সুমিত। লোকটা যেন তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইছে। ব্যাপারটা হতে দেওয়া ঠিক নয়।

'না না চিনবেন কী করে!'

'তা হলে!'

'স্যার, আপনার সঙ্গে একটা ব্যবসার কথা বলতে এসেছি।'

'ব্যবসা,' মজা লাগল সুমিতের, 'আমি ব্যবসা করি না।'

'আমি করি স্যার।'

'কীসের?'

'হবে হবে, চা খান আগে।' সিগারেট ধরিয়ে মুঠো করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল লোকটা। এখন ওর চোখ বন্ধ। যেন সময় নিয়ে পরিবেশ তৈরি করতে চায়। জামাকাপড়ে লোকটার অবস্থা তেমন ভাল নয়। হলদে টেরিলিনের শার্টের ফাইবার উঠি উঠি করছে। এই ধরনের শার্ট আজকাল কেউ পরে না। নাকের লোমগুলো আরশোলার ঠ্যাঙের মতো বেরিয়ে এসেছে। লোকটার সারা শরীরে শৌখিনতার মধ্যে বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর লাল সুতোয় বাঁধা পেতলের একটি তাবিজ তার ওপর ইংরেজিতে নাম খোদাই করা বি জি।

'কী বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।' সুমিত পা ঘষলো।

'আপনার ঘরে স্যার চারটে নাগাদ লোক ঢুকেছিল।' বয় চা দিয়ে যেতেই খুব সহজ গলায় লোকটা বলল। 'আমি প্রথম ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোর, পরে বুঝলাম, না।'

সোজা হয়ে বসল সুমিত, 'আপনি দেখেছেন?'

ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'আপনাদের পাশের বাড়িটা তো একটা স্কুল না। ওর ছাদ থেকে আপনাদের ছাদে চলে এল লোকটা। তারপর একটা জানালায় মুখ দেখলাম। মুখ দেখেই বোঝা যায় নিরাশ হয়েছে। তারপর নীচে একটা জিপের দিকে হাত নেড়ে কী বলে চলে এল স্কুল বাড়ি দিয়ে। জিপটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, আমি লক্ষ করিনি। লোকটা জিপে উঠে বলেছিল, একটাও পেলাম না, আসলটাও নেই। কথাটা আমি শুনেছি স্যার।' হঠাৎ লোকটা ওর হাত চেপে ধরল, 'স্যার, তিনদিন ধরে আপনি আমাকে খুব ঘুরিয়েছেন, একটু যে একা পাব তার উপায় নেই। মেসে বা অফিসে যেতে সাহস হয় না। এ দিকে আমার ক্লায়েন্ট মাইরি—মালটা আমাকে দিয়ে দিন স্যার, প্লিজ।'

'মাল? কী যা তা বলছেন?' রেগে গেল সুমিত।

মুখ নিচু করে চায়ের তলানিটা খেল লোকটা, তারপর হেসে বলল, 'চিঠিগুলোর কথা বলছি স্যার।'

'চিঠি—কীসের চিঠি?' বিরক্ত এবং অবাক হয়ে সুমিত চোখ কোঁচকাল। লোকটা তাকে কী বলতে চায়। বলছে কদিন থেকেই ফলো করছে। শালা! এই কদিনে সে অনেক কিছুই করেছে যা এই লোকটা দেখেছে। অনেক কিছু, যা নিজে নিজে করা যায় এবং যা নিজের কাছে সাধারণ ব্যাপার তা অন্য কেউ জানলে বা দেখলে বিচ্ছিরি হয়ে যায়। ভরা বাসে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ভাল বুক আড়চোখে দেখতে বেশ লাগে কিন্তু যখনই বুঝতে পারা যায়, আর কেউ ব্যাপারটা দেখছে ঠিক তখন সব তেতো হয়ে যায়। এই লোকটা ওর নিজস্ব ব্যাপার—। ঠোঁট কামড়াল সুমিত। এ শালা চিঠি চাইছে। কার চিঠি?

'স্যার, আমার ক্লায়েন্ট খরচ করতে রাজি আছে, আপনি চিঠিগুলো দিয়ে দিন।' দেশলাই চাওয়ার মতো মুখ করে লোকটা বলল, 'পরিষ্কার করে বলুন, আমি বুঝতে পারছি না।' সুমিত ওর চোখের দিকে তাকাল। শালার চোখ কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না।

চেয়ারটা টেনে নিল লোকটা, 'আর কারও চিঠি আছে নাকি আপনার কাছে? দিয়ে দিন স্যার, ফিফটি ফিফটি হয়ে যাবে।'

'কী পাগলের মতো বলছেন?' ধমকে উঠল সুমিত। ওর গলার স্বর শুনেই লোকটা চট করে হাতের তাবিজটা আঁকড়ে ধরল, ধরে হাসল, 'রাগ করবেন না স্যার। এইটাই আমার ব্যবসা। আগে লোকে একটাই প্রেম করত, আমরাও দুটো পয়সা পেতাম। ব্যাপারটা যে অনেকদিন গড়াত। আর এখন নাকি একটাই প্রেম ভেঙে ভেঙে একে দেয় তাকে দেয়। শালা গা ধোওয়া জলের মতো, কেউ কেয়ারই করে না। যাক, এই কেসটা খুব ভাল পেয়ে গেছি স্যার। তবে আপনার হেলপ চাই। আপনি রেণুদেবীর চিঠিগুলো আমাকে দিয়ে দিন। পার্টি আপনাকে ক্যাশ দেবে। বলুন কত চাই স্যার।'

রেণু! বিস্ময়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতের দম বন্ধ হয়ে গেল। এই দুটো অক্ষর যখন

এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন কেন সমস্ত শরীর এমন অসাড় হয়ে যায়। পৃথিবীতে তো এই নামের কত মেয়ে আছে, তবু শব্দটা এমন করে বুকের মধ্যে ছটফটানি ছড়িয়ে দেয় কেন? কী সহজে একটা পদ্মপাতা মুখ চোখের সামনেটা ভরাট করে দেয়!

লোকটার দিকে তাকাল সুমিত। এর মুখে নামটা এত বিশ্রী শোনাচ্ছে। 'আপনি রেণুকে চেনেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না, না, ছি, ছি। আমাকে ওঁর স্বামী এনগেজড করেছেন। তবে একদিন দেখেছিলাম একটু, সত্যিই আমাদের স্ত্রীরা দেখতে কী বিচ্ছিরি।'

'রেণুর স্বামী আপনাকে পাঠিয়েছে?' বিস্ময়ে ভাল করে কথা বলতে পারছিল না সুমিত। রেণু, রেণুর স্বামী। রেণুর স্বামীকে কোনওদিন দ্যাখেনি ও।

'হ্যাঁ স্যার। উনি ভদ্রভাবে কাজটা সারতে চান। আমাকে বলেছেন চিঠিগুলি নিয়ে যেতে, যা দাম লাগবে দিয়ে দেবেন। খুব ঝামেলা চলছে বোধহয়, বুঝলেন না!'

উঠে দাঁড়াল সুমিত। লোকটা হাঁ করে ওকে দেখছিল। কোনও কথা না বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল সুমিত। চট করে তাড়াতাড়ি বয়ের দিকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ওর পেছন পেছন ছুটে এল লোকটা, স্যার, আপনার কাছে একটা চিঠি আছে রেণুদেবীর। সেই যে যেটায় উনি—কনফেশন—মানে আপনার আগে যাদের যাদের সঙ্গে—কিছু মনে করবেন না স্যার—ওই চিঠিটাই দরকার। পার্টি এক হাজার দেবে।'

'এসব—এসব কী করে জানা গেল!' ঘোরের মধ্যে বলল সুমিত।

'সে স্যার দারুণ ব্যাপার। রেণুদেবী নাকি বাথরুমে বসে খবরটা লিখেছিলেন ভাইকে। সেটা পোস্ট করে বাড়ির ঝি। মুখার্জি সাহেব মানে রেণুদেবীর স্বামী সেটা ধরে ফেলেন। আর তাতেই আপনার নাম ধাম—বুঝলেন স্যার। তা আমি বলি কী মুখার্জি সাহেবের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি, চিঠিটা আপনি দিয়েই দিন।'

'আমি রেণু বলে কাউকে চিনি না।' সোজা হাঁটতে লাগল সুমিত। বাঁ হাতের তাবিজটা আঁকড়ে ধরে পেছন পেছন এল লোকটা, 'কী যে ইয়ার্কি করেন স্যার, আপনি মাইরি—'

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার জামার কলার মুঠো করে ধরে প্রায় ওপরে টেনে তুলল সুমিত, 'মেরে হাড় ভেঙে দেব বদমাস, ভাগ।' ছেড়ে দিতেই ধপাস করে বসে পড়ল লোকটা মাটিতে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্যার। আপনি আজ একটু উত্তেজিত, আমি আবার আসব, আপনি ভাবুন ভাল করে। মুশকিল হল আর একটা পার্টি আজ আপনার ঘরে এসেছিল—কম্পিটিটার কি না কে জানে!'

পথ চলতে চলতে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে আশে-পাশে। সুমিত আর তাকাল না, সোজা মেসের রাস্তা ধরল। এখন রাত হয়েছে বোঝা যায়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওর আবার মনে পড়ল চোরের কথা। লোকটা বলছে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তা হলে কি ওরা এই লোকটার মতো একই ধান্দায় এসেছিল? এরা কারা তা হলে। বাইরে হাওয়া বেশ জোরে বইছে, এতক্ষণ রেস্টুরেন্টে বোঝা যাচ্ছিল না। জোরে জোরে পা ফেলে মেসে ফিরে এল সুমিত।

আলো জ্বলছিল ঘরে। সুমিত দরজা ভেজিয়ে একটু চুপ করে দাঁড়াল। এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এসেছিল সে কী জন্য এসেছিল। দ্রুত পায়ে ও খাটের কাছে চলে এল। খাটের সামনে দেওয়ালে যেদিকে মুখ করে শোয়, সেখানে একটা ছবি টাঙানো। বড় ফ্রেমের মধ্যে বসে সুমিত হাসছে। হাফ বাস্ট ছবি, কমলা রঙের পুলওভার পরা। তখন ওর মাথার চুল বেশ ফাঁপানো ছিল, চিবুকের কাছটা মিষ্টি মিষ্টি দেখাত। হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে দেওয়াল থেকে খুলে আনল ও। বুকের মধ্যে যে ভয়টা রবারের বলের মতো ড্রপ খাচ্ছিল, কাচের ফ্রেমের গায়ে লাগা ধুলো দেখে তা গড়িয়ে গড়িয়ে গেল। না, এখানে কারও হাত পড়েনি। ছবিটার পেছন দিকে পেরেকের বেড়ার মধ্যে অনেককাল পড়ে থাকা মোটা খামটাকে বের করল সুমিত। অনেক, অনেকদিন হাত দেয়নি ও। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল এখন, নিছক খেয়ালের বশে একদিন ও নিজের ছবির পেছনে ছোট পেরেকের গায়ে খামটাকে বিদ্ধ করে রেখেছিল। কেন কে জানে, হয়তো কোনও কারণ ছিল না, কিংবা মনে মনে অন্য কিছু কাজ করছিল। এখন মনে হল, সে যাই হোক যে এসেছিল তার সুমিতের ছবির দিকে তাকানোর ভাগ্যিস প্রয়োজন ছিল না।

খামটা খুলল সুমিত, আর খুলতেই এক রাশ শিউলি ফুলের মতো একটা মুখ হেসে উঠল, যার নীচে ছোট ছোট গোটা অক্ষরে লেখা, 'এই আমি রেণু।'

আমি রেণু। এই যথেষ্ট, আর কিছু জানবার দরকার নেই। আমি রেণু, এতেই আমি সম্পূর্ণ। এই আমি তোমার সামনে হাসছি, আর কী হবে জেনে। গ্লসি পেপারে ছাপা ছবিটায় রেণু ঘাড় কাত করে হাসছে। মাথার দুপাশে খোলা চুলের কালোয় ফরসা মুখখানা যেন আরও টাটকা লাগছে। দুটো বড় বড় চোখে (রেণু, তুমি কি কাজল পরতে?) খুশির সুন্দর কারুকাজ, কপালটা একটু চওড়া তাই খুব বড় করে টিপ পরা বলে চোখে আরাম লাগে। ছবিতে রেণু হাসছে, হাসলে অল্প গজদাঁত দেখা যায়। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকের ভিতর পাক খেয়ে যাওয়া বাতাস কেঁপে কেঁপে নিশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায়। ছবিটা দেখতে দেখতে সুমিত স্পষ্ট শুনতে পেল, 'এই, আমি রেণু।'

ছবিটার সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে যে দশপাতার চিঠি তার জন্যেই কি ওরা এসেছিল? রেণুর স্বামীর এটা দরকার। রেণুর বিরুদ্ধে বোধহয় এটাকে কাজে লাগাবেন। হেসে ফেলল সুমিত, কী করেছ রেণু, এমন বোকামি কেউ করে। আসলে রেণু তুমি একটা আস্ত মেয়ে, ছবিটার দিকে তাকাল সুমিত, মেয়েদের মতো চট করে বোকামি করতে কোনও ছেলে পাবে না। চিঠিটা খুলল ও। এর প্রত্যেকটা শব্দ ওর মুখস্থ। এত সুন্দর করে লেখা চিঠি ও কখনও পড়ে নি। না, কোনও সম্বোধন নেই, বছর দেড়েক আগের একটা বসন্তকালের তারিখ চিঠির মাথায়। শুরুতেই কী একটা লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে কালি দেওয়া বোঝা যায় না কিছুতেই। তারপর, 'আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে।' আর চিঠির শেষে 'ভাল থেকো কিন্তু। আমি রেণু।' আর এর মধ্যে যে লাইনের পর লাইন, যেগুলো এক সন্ধ্যায় সুমিতের বুকে ছোট ছোট চিতা সাজিয়ে দিয়েছিল, যেগুলো সত্যি নয় প্রমাণ করার জন্য ও পাগলের মতো কয়েকজনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এখন বুকের মধ্যে সেগুলো চৈত্র দিনের দুপুরের হাওয়ার মতো তাপ ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

হলদে শাড়ি পরত রেণু। মাথার চুলের প্রান্তে ছোট্ট একটা বাঁধুনি, চুলগুলো ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে থাকত চওড়া পিঠে। মেয়েদের পিঠ ভরাট হলে এত সুন্দর দেখায় রেণুকে না দেখলে বোঝা যাবে না। খুব লম্বা নয় রেণু কিন্তু গলার গড়নে ওকে লম্বা দেখাত বেশ। বছর আড়াই আগে ওরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ক্লাসের ছাত্র।

খুব পরিষ্কার সেই বিকেলটা। সবে সুধাংশুবাবুর ক্লাস শেষ হয়েছে। এই একটা ক্লাস করার জন্য ওরা কফি হাউস থেকে ফিরে আসত। শেষ হতেই সুমিত বেরিয়েছে এমন সময় রেণু ওর সামনে এল। বাঁ হাতে কপালের চুল সরিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'আচ্ছা, আপনি এত কী দ্যাখেন বলুন তো।'

কথাটা শুনে কেমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল সুমিত। এভাবে ও এসে কথা বলবে—এতটা ভাবেনি কোনওদিন। যখনই ক্লাসে এসেছে ও পেছন দিকে বসেছে। আর সেইখান থেকে সামনে বসা ছেলেমেয়ের মাথার পাশ দিয়ে একটা সরল রেখা হয়ে যেত একসময়, যার অপরপ্রান্তে থাকত রেণুর মুখ। অনেকদিন ওর নাম জানেনি সে। মফস্বলের ছেলে ও, নিজে এগিয়ে গিয়ে কলকাতার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার মতো মানসিক গঠন হয়নি তখনও। মেয়েদের যে একটা নিজস্ব ইন্দ্রিয় আছে যাতে তারা বুঝতে পারে কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না, রেণু বুঝে ফেলেছিল প্রথম দিনই। নইলে দু বার তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিল কেন? তারপর একসময় এটা একটা মজার খেলা হয়ে গেল সুমিতের কাছে। আর এই খেলার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল এমনই যে পরপর কয়েকদিন ও না আসাতে মন মেজাজ বিচ্ছিরি হয়ে গেল সুমিতের। ওর নাম জেনেছিল সে, অশোক ওর বন্ধু, এসে বলেছিল, 'দারুণ ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে—যা না বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নে। আসছে না কেন দ্যাখ।'

'যাঃ, আমার সঙ্গে আলাপই নেই।' হেসেছিল সুমিত।

'তুই একটা গুড ফর নাথিং। একবছর ধরে একটা মেয়েকে শুধু দেখেই গেলি, গিয়ে আলাপ করতে পারলি না পর্যন্ত।' অশোক ঠাট্টা করেছিল।

সেই মেয়েই কদিন বাদেই ফিরে ক্লাস শেষে ওর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনি এত কী দ্যাখেন বলুন তো?'

এক মুহূর্তেই লক্ষ বার মনে মনে বলে ফেলল সুমিত, তোমাকে। মুখে কিছু বলল না, মাথা নিচু করে হাসল।

'কী কিছু বলছেন না কেন?' রেণুর গলা যেন ওকে ছোট ছোট টোকা দিয়ে গেল। রেণুর মুখের দিকে তাকাল ও, 'বলতে ঠিক সাহস হয় না।'

'কেন?' ঘাড়ের পিছনে আলতো ভাঁজ ফেলে চিবুক উঁচু করে তাকাল রেণু। চকিতে সুমিতের মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। চৈত্র মাসের সকালে মাটির এক ফুটোওয়ালা হাঁড়িতে জল ঢেলে মা এমন করে তাকাতেন। আর সেই ফুটো চুঁইয়ে একটা একটা করে জলের ফোঁটা পড়ত নীচের পাতা শুকিয়ে আসা তুলসীগাছে।

'কী জানি, হয়তো আপনি খুব সুন্দর বলে, সুন্দর এবং গম্ভীর।' অনেকক্ষণ ডুবে থেকে হুস করে মাথা তুলে নিশ্বাস নিলে বোধহয় এমন হয়, কথাটা বলতে পেরে সুমিত সেইরকম তৃপ্তি পেল।

'যা, আপনারা এমন বাজে কথা বলেন। আসলে আপনি খুব ভীরু, সাহস টাহস নেই। তাই না?' হাসল রেণু।

'তাই হবে। ছেলেবেলা মফস্বলে কেটেছে তো, ঠিক বুঝতে পারি না সাহসের এইসব ব্যাপার।'

'আমার নাম রেণু, রেণু রায়। আপনার নাম কিন্তু আমি জানি।' হাসল রেণু।

'আপনার নামও আমি জানতাম।'

'আমি কিন্তু খুব খারাপ মেয়ে, খু-উ-ব।'

'যাঃ, এরকম মুখের মেয়ে কখনও খারাপ হতে পারে না।'

রেণু কাছে থাকলে কলকাতাকে অন্য রকম লাগে। য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পুরনো বই-এর সার সার দোকানের সামনে দিয়ে রেণুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া মানুষগুলোকে যিশু খ্রিস্টের মতো মহৎ মনে হয়। কফি হাউসের টেবিলে পাশাপাশি বসে চারপাশের একটানা চেঁচামেচিকে সমুদ্র গর্জনের মতো নির্জন মনে হয়।

ওয়াই এম সি-এর রেস্তোরাঁর নির্জন কেবিনে বসে রেণু ওর কাঁধে মুখ রেখে একদিন বলে ফেলল, 'তুমি খুব ভাল, জানো, খুব ভাল।'

এক লক্ষ পদ্মফোটা সরোবরের মতো বুকের ভিতরটা টলটল করে উঠল সুমিতের। ঠিক এমন করে কোনও মেয়ে তাকে বলেনি কোনওদিন।

'আমি খুব খারাপ মেয়ে, জানো?' রেণু আবার বলল।

'হুঁ।' রেণুর শরীরের গন্ধ (আহা, সুবাস বলে না কেন?) চোরের মতন বুক ভরে নিতে নিতে সুমিত বলল।

'সত্যি বলছি। দ্যাখো না, এই আমি যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম। তুমি তো এতদিন শুধু দেখেই গেছ, এগিয়ে আসোনি তো। আমি কেমন নির্লজ্জের মতো কথা বললাম।' রেণু কথাটা বলে মাথা সরিয়ে সোজা হয়ে বসল। তারপর নিজের হাত দুটো চোখের সামনে ধরে হাতের রেখাগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'কী করব বলো, ওই ক'দিন আসিনি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করলেই তোমার মুখটা মনে পড়ত। কী অস্বস্তি, শুতে বসতে নিস্তার নেই! মনে মনে বুঝলাম কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি। তারপর ক্লাসে এসে তোমাকে আবার দেখলাম। বুঝলাম আমাকে দেখতে পেয়ে তুমি খুশি হয়েছ, আর পারলাম না, জানো, তাই আমি নির্লজ্জ হয়ে গেলাম।' একটা হাত নামিয়ে সুমিতের হাতের ওপর রাখল রেণু, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম।'

মাথার ওপর ছোট্ট পাখার হাওয়া রেণুর চুলগুলো নিয়ে খেলা করছিল। সুমিত সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, এই রকম করে তুমি নির্লজ্জ হয়ে আমার কাছে থাকো রেণু, আমি বেঁচে যাই।

রেণুর সঙ্গে দুপুরে অথবা আলো মরে আসা বিকেলে এই কলকাতার রাস্তায় হেঁটে গেছে ও। য়ুনিভার্সিটি থেকে হাঁটতে হাঁটতে রাসবিহারীর মোড়। ওখান থেকে বাসে চাপত রেণু। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি, সেই অবধি কখনও যায়নি সুমিত।

'ভীষণ গোঁড়া জানো, বিশেষ করে মা, তুমি যদি দ্যাখো ভাবতেই পারবে না।' টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে

হাঁটতে হাঁটতে রেণু বলছিল। ওর খোলা চুলে গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা মুক্তোর মতো চকচক করছিল, 'তুমি বিশ্বাস করবে না হয়তো, কিন্তু জানো না, মা না এখনও ঘুম থেকে উঠে বাবার চরণামৃত খায়।' রেণুর মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিল সুমিতের। কী বিশ্বাসে মানুষেরা এখনও বেঁচে থাকে!

'আর তোমার বাবা?' সুমিত জিজ্ঞাসা করছিল।

'বাবার সঙ্গে আমার দেখাই হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি নেই, রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে দেখি ফেরেননি। যা কিছু ব্যাপার তা ভায়া মা। শুধু রবিবার আমরা একসঙ্গে খাই। তখন প্রত্যেক সপ্তাহে খাওয়ার শেষে বাবা বলেন, 'বাইরের জগৎ নিয়ে বেশি মেতে থেকো না রেণু। বোঝ!' ঘাড় নাচাল ও।

'আর তোমার দাদা?'

'দাদা আমার মাইডিয়ার। ওর জন্যেই ও বাড়িতে থাকা যায়। ওকে আমি সব বলি, সব। এই, তোমার কথাও বলিছি।' রেণু সুমিতের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'সর্বনাশ, কী বলেছ?' চোখ কপালে তুলল সুমিত।

'এই সব ব্যাপার। দাদা কী বলল জানো, বলল, 'একদম বাচ্চা ছেলে, এখনও কনসেপশন তৈরি হয়নি। তুই একটা পাগল।'

অশোক বলছিল, 'তোদের কিন্তু দারুণ মানিয়েছে, কে বয়সে বড় বোঝা মুশকিল।' সুমিত, রেণু, অশোক আর খুব কম, ঝুমা নামের একটা মেয়ে একসঙ্গে আড্ডা দিত তখন। একবার অশোকের পরিকল্পনা মতো কলেজ পালিয়ে ডায়মন্ডহারবার চলে গিয়েছিল ওরা।

ঠিক ছিল ধর্মতলায় এসে বাস ধরবে সবাই। মনুমেন্টের সামনে দশটা না বাজতেই এসে হাজির হয়েছিল সুমিত। তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। ও জায়গাটায় ছায়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। রোদ্দুরে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল ওর। চারপাশে ফেরিওয়ালারা ঘুরছে। একটা বউ কচি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওর সামনে হাত পাতল। সুমিত দেখল বউটির গায়ের রং কোনওকালে কালো ছিল হয়তো, এখন ময়লা জমে জমে কেমন শ্যাওলা ধরে গিয়েছে। গায়ে জামা পরেনি অথবা নেই, বাচ্চাটা ওর শুকনো বুক নিয়ে খেলা করছে। পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়ে সুমিত জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'তোমার দেশ কোথায়?' ও ভেবেছিল বউটা পাকিস্তানের গল্প করবে নির্ঘাত। কিন্তু সেরকম কিছুই করল না, শিরাওঠা রোগা হাত বাড়িয়ে (যেটায় একটা শাঁখা বিচ্ছিরি রকমের সাদা) বলেছিল, 'দক্ষিণে।' জায়গার নাম জানতে চেয়েছিল সুমিত। বউটা পয়সা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলছিল, 'ডায়মন্ডহারবার।'

চমকে উঠেছিল ও। বউটা চলে গেলে মনে মনে বলেছিল, আমি তোমার দেশে যাচ্ছি, তুমি যাবে? সে তখন দূরে একটা কাবুলিওয়ালার পেছন পেছন হাত বাড়িয়ে ঘুরছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। এখন ওরা মজা করে বেড়াতে যাচ্ছে যেখানে সেখান থেকে একটি শেষ যুবতী মেয়ে কলকাতায় চলে এসেছে না খেতে পেয়ে। না কি অন্যকিছু, কে জানে। এই সময় ও ঝুমাকে দেখতে পেল। একটা মেয়েদের শান্তিনিকেতনী কাজ করা বড় হাতব্যাগ নিয়ে ঝুমা এল, 'কী ব্যাপার মুখ গোমড়া করে বসে আছেন একা, পার্টনার আসেনি?'

ঝুমার কথাবার্তাই এই রকম। ওর সঙ্গে তেমন মেলামেশা করেনি সুমিত, বরং এড়িয়েই গেছে অনেক দিন। সাজপোশাকে নিজেকে দেখানোর চেষ্টা আছে ঝুমার মধ্যে। এক একটা মেয়ে থাকে যাদের শরীরের বাঁধুনি ভাল এবং সেটাকে কাজে লাগানোর কায়দাকানুন তাদের ভাল করে জানা—ঝুমা সেই ধরনের মেয়ে। এখনও গালের মাঝখানে কয়েকটা ব্রণর দাগ কটা চোখের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গুছিয়ে আছে। সুমিত দাঁড়িয়ে থেকে বউটাকে দেখছিল আর ঝুমা বলল, বসে আছে ও। এই রকমই কথাবার্তা। খুব সেজেছে ঝুমা।

সুমিত হাসল, 'ওরা এখনি এসে পড়বে। এত কী এনেছেন?'

'সব, জামাকাপড়, তোয়ালে। যদি দরকার পড়ে, বলা যায় না। ধ্যুৎ, ওরা আসছে না কেন।' ঘুরে বাসগুলোকে দেখল ঝুমা, 'তার চেয়ে বলুন আমরাই চলে যাই।'

'সেকী! কোথায়?' কপট বিস্ময়ে বলল সুমিত।

আর এই সময়েই ওরা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুমা বলল, 'বাস হয়ে গেল, আপনি আর চান্স

পেলেন না।'

একটা খালি বাস পেয়ে গেল ওরা। অফিসের সময় বলে ফেরার বাস খালি যাচ্ছে। সামনের সিটে অশোক আর ঝুমা, পেছনে ওরা। মেয়েরা জানালার ধারে বসেছে। বাস চলতে আরম্ভ করলে রেণু বলল, 'যদি কেউ দেখে ফ্যালে!'

ফিসফিস করে সুমিত বলল, 'তা হলে ঘোমটা দিয়ে নাও।'

চকচক করে উঠল রেণুর চোখ। খালি বাসের দিকে চট করে নজর বুলিয়ে ও আঁচলটা মাথার ওপর দিয়ে ঘোমটার মতো করে নিল। বাসন্তী রঙের শাড়ির জমিতে ছোট ছোট কালো কড়ি আঁকা। আঁচলের একটা কোনা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'কেমন লাগছে গো?'

এক একটি মেয়ে আছে, যাদের গলা ঈষৎ লম্বা এবং গায়ের রঙে বিকেলের রোদ মাখামাখি, আঁচলের অর্ধেক বৃত্তে তাদের মুখ অপরূপ দেখায়। লোভীর মতো কিছুক্ষণ দেখল সুমিত, রেণুর চোখে চোখ রাখল। একচোখ হেসে রেণু কোনও কথা না বলে আবার জিজ্ঞাসা করল মুখ দুলিয়ে। একটা হাত ওর পেছনের সিটের ওপর রেখে সুমিত বলল, 'দারুণ। ঠিক কচ্চা মেয়ের শাড়ি পরার মতো বিউটিফুল।' এক ঝটকায় আঁচল খুলে ফেলে বাইরের দিকে তাকাল রেণু, 'অসভ্য।'

বেহালা ঠাকুরপুকুর একে একে ছাড়িয়ে ওরা দুপাশের ধানক্ষেতের ওপর চোখ রাখল। বাসে এখন মোটামুটি ভিড়। বেশিরভাগ চাষিবাসি মানুষ। ডায়মন্ডহারবারে এ ধরনের ছেলেমেয়ে দেখতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মুখ চোখ কলকাতার মানুষের মতো উদাস। সামনের সিটে অশোক আর ঝুমা চুপচাপ বসে। ঠিক বসে বললে ভুল হবে, ঝুমার শরীরের অনেকটা অশোকের ওপর চাপানো। সুমিত দেখল, প্রায় অশোকের কাঁধে হেলান দেওয়া ঝুমার মাথার চুলে কীসব পুঁতির মালার টুকরো জড়ানো। এখন রেণুও চুপ করে বসে আছে। জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাসে ওর কপালের ওপর চুলগুলো বানমাছের মতো খেলা করছে। রোদের তাতে রেণুর চিবুক কী আদুরে দেখাচ্ছে। বুকের মধ্যে অনেক তৃপ্তি নিয়ে সুমিত চোখ বন্ধ করল খানিক।

সারাটা দিন রোদে রোদে ঘুরে কেমন করে যেন ওদের কেটে গেল। সবে গড়ে ওঠা একটা হোটেল-কাম-রেস্তোরাঁ নদীর গায়ে ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দুপুরে ওরা সেখানে গিয়ে উঠল। রিকশায় চেপে আসতে হয়েছে ওদের। দুটো রিকশা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে কে আগে যেতে পারে। রেণুর উৎসাহ ছিল বেশি। রিকশাওয়ালাকে 'ভাই, আরও জোরে, সাব্বাস দাদা, ওদের হারিয়ে দাও' এইসব বলে উৎসাহ দিয়েছে। হোটেলটা নির্জন, এখনও মানুষজনের বসতি কাছাকাছি হয়নি। এপাশে নদী ওপাশে ধানজমি আর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে বেশি বয়সের মহিলার সিঁথির মতো নিরক্ত রাস্তা।

হোটেলে এসেই ঝুমা বলল, 'আর পারছি না বাবা, আবার হাঁটলে আমার পা আমার থাকবে না।'

অশোক দাঁড়িয়েছিল পাশে। বেতের সাজানো চেয়ারে ঝুমা ধুপ করে বসে গা এলিয়ে দিয়েছিল। ওদের মাথার ওপর একটা লাল নীল ডোরাকাটা কাপড়ে রোদঢাকা। জায়গাটা নদীর মুখোমুখি। হাওয়া দিচ্ছে খুব। রেণু আর সুমিত সামনের রেলিং-এ ভর করে দূরের জাহাজ দেখছিল। ঘাড় ঘোরাল সুমিত, ঝুমা হাত নেড়ে অশোককে মাথা নামাতে বলল। হোটেলের ভেতর থেকে একটা বেয়ারা ট্রেতে করে চা নিয়ে আসছে। ওরা ওঠার সময় বলে এসেছিল লবিতে চা দিতে। অশোক মুখ নামাল। ঝুমা কী বলছে বুঝতে পারল না সুমিত, তবে অশোক কথাটা শুনে হেসে উঠে ঝুমার গায়ে আলতো করে চড় মারল, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'গুড, গুড।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে রেণু বলল, 'চল ওই ভাঙা লাইটহাউস দেখে আসি।'

'লাইটহাউস ভেঙে গেলে দেখার কী আছে!' ঝুমা বলল।

রেণু কোনও কথা বলল না প্রথমটা, তারপর হাসল, 'শুনেছি ওর ওপরে উঠলে সমুদ্র দেখা যায়।'

সুমিত উঠে দাঁড়াল, 'চল সবাই, আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি।'

এখান থেকে অনেক দূরে নদী যেখানটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গেছে সেখানে আবছা মতো উঁচু গম্বুজ দেখা যায়। ঝুমা সেদিক চেয়ে চোখ কপালে তুলল, 'আরে ব্বাস!' আমার দরকার নেই বাবা ওখানে যাবার, মরে যাব ভাই একদম। তোরা যা। আমরা এখানেই থেকে যাচ্ছি।'

সুমিত একটু বিরক্ত হচ্ছিল ঝুমার আলসেমির জন্য। একসঙ্গে বেড়াতে এসে এক-একজন এক এক রকম করবে এটা ঠিক নয়। ও অশোকের দিকে তাকাল। অশোকের ভূমিকাটা ও ঠিক বুঝতে পারছে না। ও অশোককে বলল, 'কীরে।'

যেন নদী দেখছে এইভাবে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অশোক ঘাড় ঘুরিয়ে সুমিতকে ডাকল, 'শোন।'

সুমিত যেতেই অশোক বলল, 'তোরা ঘুরে আয়।'

'এই রোদ্দুরে এখানে বসে থাকবি তোরা!' সুমিত রাগ করছিল।

'ধ্যুৎ, রোদ্দুরে কেন! এটা তো হোটেল, ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তোরা যাবার সময় আমাদের ডেকে নিস।' হাসল অশোক।

'ঘর ভাড়া করে কী করবি—পয়সা নষ্ট।' সুমিত বলল।

'ঝুমার ইচ্ছে ঘরে বসেই সমুদ্র দ্যাখে। প্রত্যেকের তো ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে, আমরা তো সেখানে বাধা দিতে পারি না। ঝুমা ভাই এক্সপেরিয়েন্সড মেয়ে, এ রকম চান্স ছেড়ে দেওয়া যায়, বল?' আবার চোখ কুঁচকে হাসল অশোক, 'তুইও একটা ঘর নে না।'

চমকে উঠল সুমিত। এই ব্যাপারটা ওর খেয়ালই হয়নি। মনে পড়ল, ঝুমা তোয়ালে শাড়ি এনেছে সঙ্গে। একদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে এসে এসব আনে না। তা হলে কি ওরা আগের থেকেই এই রকম পরিকল্পনা করে নিয়েছিল। এক ঘরে ওরা একা কিছুক্ষণ থাকবে, ঝুমার জামাকাপড় সঙ্গে নিয়ে আসা আর অশোকের চোখ কুঁচকে হাসি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে সুমিতের কাছে। অশোক ওর বন্ধু। ওরা একসঙ্গে কলেজ থেকে পড়েছে। সেই অশোককে বুঝতে ওর কষ্ট হচ্ছিল। অশোক কবিতা লেখে, য়ুনিভার্সিটি পত্রিকার সম্পাদক, দারুণ ব্রাইট ছেলে। সুমিতকে সঙ্গে করে ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য যে এটাই হবে—গুলিয়ে যাচ্ছিল সুমিতের। ঝুমার দিকে তাকাল ও। বেতের চেয়ারে মাথা পিছনে হেলিয়ে বসে আছে ঝুমা। হঠাৎ ওর মনে হল ঝুমাকে ঠিক সমবয়সি ছাত্রী বলে মনে হয় না, ওর কোমরের যে ভাঁজ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বা গলার খাঁজ, বুকের আদল, কয়েকমাস বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের মতো পুরুষ্ট। অশোক বলল, 'ঝুমা অভিজ্ঞ। হতে পারে, চাষিরা মেঘ দেখে বলে দেয় বৃষ্টি হবে কি না।' রেণু ওর দিকে এগিয়ে আসছে, সুমিত দেখল। রেণু কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওর মুখ চোখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঝুমা অবশ্য রেণুর বন্ধু নয়, মেলামেশাও কম, তবু ওর মনে কি কিছু হচ্ছে না? খুব সহজ গলায় রেণু বলল, 'চলো, আমরা বেড়িয়ে আসি।'

সুমিত কিছু বলার আগেই অশোক বলল, 'তোরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুরে আয়, চারটের বাস ধরব।'

সুমিত আর রেণু নীচে নেমে এল। সুমিত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকাল, না ওদের দেখা যাচ্ছে না। রেণু বলল, 'চলো, হাঁটি।'

নদীর ধার দিয়ে নরম মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে বাঁদিকে মাঠ রেখে। ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। রেণুর মুখ একটু গম্ভীর, সুমিত ইচ্ছে করেই কথা বলছিল না। ওপাশে গোরু চরছে, একরাশ ছাগল গলার ঘণ্টা বাজিয়ে ওদের দিকে আসছে। রেণু সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এই মারবে না তো।' সুমিত হেসে বলল, 'ধ্যুৎ, ছাগলের সে-সব বুদ্ধি আছে নাকি।'

টুং টাং ঘণ্টাগুলো বাজছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বাচ্চা ছেলে ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। মাথার ওপর চাঁদিসেঁকা রোদ, ওপাশের নদীতে জেলে নৌকা ভাসছে। ছাগলরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তা জুড়ে ওদের মধ্যে এসে পড়ল। হঠাৎ রেণু সুমিতের হাত ধরে ফেলল, একটা বড়সড় ছাগল ওর গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। জলস্রোতের মতো ওরা সুমিতদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেল। যাবার সময় বাচ্চাটা রেণুর দিকে হলদে দাঁত বের করে হেসে গেল। রেণু ভয় পেয়েছে বাচ্চাটা ধরতে পেরেছিল।

আর একটু এগোলেই বাঁদিকে ধানক্ষেত। আলের মতো উঁচু রাস্তায় ওরা হাঁটছিল। দূরে এখনও অস্পষ্ট হয়ে আছে ভাঙা লাইটহাউস। হঠাৎ রেণু বলল, 'ঝুমাকে কেমন লাগল।'

সুমিত ওর দিকে তাকাল একবার, কিন্তু উত্তর দিল না কিছু।

'আমার খুব লজ্জা করছে, তুমি কিছু মনে করো না। হ্যাঁ?' রেণু আবার বলল, 'ও ওইরকম মেয়ে।

অশোক কীভাবে ওকে নিয়েছে জানি না তবে মন থেকে নিলে বিপদে পড়বে।'

'কেন?' সুমিত ওর দিকে ফিরল।

'ঝুমার অ্যাম্বিশন অনেক। মেয়েরা সবাই জানে প্রফেসর ভট্টাচার্যের সাবজেক্টে ও লেটার মার্কস পাবে।'

'এখন থেকেই কী করে জানলে।' সুমিত অবাক হল।

'প্রফেসর ভট্টাচার্য প্রত্যেকবার দু-একটা মেয়েকে লেটার মার্ক দেন, তারপর ওরা ওঁর আন্ডারে রিসার্চ করে। অনেকে ঝুমাকে ওঁর সঙ্গে একই চেয়ারে ছুটির পর বসতে দেখতে পেয়েছে।' রেণু হাসল।

সুমিত বলল, 'যাঃ।' ওর মনে পড়ল প্রফেসর ভট্টাচার্য ষাটের কাছাকাছি, দেখতে প্রায় বৃদ্ধ, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। ওর নামে অশোকই অনেক কিছু বলছে, কিন্তু ঝুমার সঙ্গে—। রেণু ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমরা ছেলেরা, ইচ্ছে করলে মনে মনে চিরকাল তরুণ থাকতে পারো, তাই না? বড় অতৃপ্তি তোমাদের।'

সুমিতের ইচ্ছে হল বলে, ঝুমার চেয়েও। কিন্তু এখন আর এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না। দুধেল ধানগাছগুলোর শরীর নিংড়ানো বাতাস নদীর জলের সঙ্গে খেলা করে যায়, অনেক দূরে সিসে রঙা আকাশের গায়ে একটা চিল কী আলসেমিতে গা এলিয়ে দেয় আর রেণুর নাকের গায়ে চিকচিকে ঘামের বিন্দু নাকছাবির মতো সুন্দর দেখায়—এইসব সম্রাটের মতো আগলে রাখতে চাইছিল ও।

সুমিত বলল, 'রেণু, আমি কিন্তু খুব সাধারণ ছেলে।'

'উহুঁ' ঘাড় নাড়ল রেণু।

'মানে?'

'সাধারণ হলে তোমাকে আমি ভালই বাসতাম না। কাউকে ভালবাসলে মানুষ আর থাকে না। আচ্ছা আমাকে না দেখতে পেলে তোমার কেমন লাগে?'

'কষ্ট হয়।'

'রাত্রিবেলায় যখন একা বিছানায় শুয়ে থাকো তখন আমাকে ভাবো!'

'তুমি?'

কোনও উত্তর দিল না রেণু। হাঁটতে হাঁটতে ঝুঁকে পড়ে একটা লম্বা ঘাস ছিঁড়ল। তারপর সেটার সবুজ তাজা ডাঁটিটা ঠোঁটের কোণে চেপে বলল, 'আচ্ছা, আমি যদি এখন মরে যাই তুমি চিরকাল আমার কথা ভাববে? অন্তত এই সব মন কেমন করা দিনগুলোর কথা, ভাববে?'

সুমিতের বুকের মধ্যে কেমন দুরু দুরু করছিল, ভয় হচ্ছিল রেণুর গলার স্বর শুনে, এই রেণুকে ও চেনে না, 'একথা বলছ কেন?'

'মনে হল তাই, আমি যে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না।' কথাটা বলে সুমিতের মুখের দিকে তাকাল রেণু। তাড়াতাড়িতে অনভ্যস্ত হাতে দাঁড়ি কামাতে গিয়ে সুমিতের চিবুকের ওপর একটা কাটা দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে, সেদিকে চোখ রেখে কী ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলল ও, 'ছেড়ে দাও এসব কথা, আমার না বেশি আশা করতে খুব ভয় হয় তাই বলে ফেললাম।'

এখান থেকে ভাঙা লাইটহাউসটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রেণু বলল, 'চলো দৌড়োই, কতদিন দৌড়োই না। স্কুলে পড়ার সময় একবার মধুপুর গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্যে, তখন খুব দৌড়োতাম। দৌড়োবে?' বাচ্চা মেয়ের মতো আঁচল কোমরে গুঁজল ও, জুতো খুলে হাতে নিল। সুমিত হাসল, 'তুমি এগোও, আমি তোমাকে ধরছি।'

'তুমি পারবে না।' বলে রেণু দৌড়োতে লাগল। আলপথের ওপর দিয়ে ওর হালকা লম্বা শরীর ছুটে গেল সামনে, সুমিত দেখল। ক্রমশ রেণু দূরে চলে যাচ্ছে, ওর খোলা চুল বাতাসে উড়ছে, ছুটতে ছুটতে ও ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকল 'এসো-ও।' সুমিতের দৌড়োতে ইচ্ছে করছিল না, রেণুর ছুটে যাওয়া শরীরটা দেখে ওর কেমন ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল ওদের মাঝখানে একটা ব্যবধান হঠাৎ তৈরি হয়ে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দূরত্বটা কমানোর জন্য ও ছুটতে শুরু করল। রেণু বুঝতে পারল সুমিত আসছে, ও আরও জোরে ছুটতে শুরু করল। নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকোর জেলেরা এই দৃশ্য দেখতে

পেল। ধানক্ষেত থেকে ছটফটিয়ে ওড়া গঙ্গাফড়িংগুলো আচমকা ভয় পেয়ে চুপ মেরে গেল। রেণুর ব্যবধান কমে আসছে। রেণু, রেণু, রেণু। বুকের মধ্যে একরাশ তৃপ্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সুমিত দেখল, হোঁচট খেয়ে রেণু উলটে পড়ে গেল আলপথ থেকে পাশের ধানক্ষেতে। পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠল, 'ও মাগো!'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল সুমিতের। ও এক নিশ্বাসে রেণুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রেণু উঠে বসে দুহাতে ডান পা আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় দাঁত চেপে ওপরের দিকে তাকাতেই সুমিত ঝুঁকে পড়ল, 'কী হয়েছে তোমার, এই, রেণু!' সুমিত হাঁপাচ্ছিল। চোখাচোখি হতেই রেণু একটু একটু করে হাসল। সুমিত দেখল, রেণুর হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। চট করে বসে পড়ল ও, জোর করে রেণুর হাত সরিয়ে দিল, 'দেখি, দেখি কী হয়েছে।' রেণু হাত সরিয়ে নিয়ে চোখের সামনে ধরল, আঙুলের পাশগুলো লালচে হয়ে গেছে, 'দেখেছ আমার শরীরে কত রক্ত!' সুমিত দেখল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের পাশটা কেটে গেছে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরল ও কাটা মুখটার ওপর। ভিতরের সাদা মাংস অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। রেণু আর চিৎকার করছে না। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে সুমিতের নার্ভাস হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। রক্তটা একটু বন্ধ হতে না হতে রুমালের অর্ধেকটা ভিজে লাল হয়ে গেল। রেণু বলল, 'তোমার রুমালটা নষ্ট করে দিলাম।' সুমিত ভাল করে বুড়ো আঙুলটা ব্যান্ডেজ করে দিল। রক্তটা বন্ধ হলেও একটু একটু ভিজে থাকল রুমালটা। হাত বাড়িয়ে রেণুর হাতে ধরে ওকে টেনে তুলল সুমিত, 'এবার উঠে দাঁড়াও ম্যাডাম।'

পায়ের গোড়ালিতে ভর করে উঠে দাঁড়াল রেণু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আলপথের ওপর উঠে এল। ওর শাড়িতে পাছার কাছে শুকনো মাটি দাগ এঁকে দিয়েছে, কনুই-এর কাছে মাটি লেগে আছে। রেণুর চটি দুটো কুড়িয়ে সামনে রেখে সুমিত বলল, 'হাঁটতে পারবে তো, দ্যাখো।' 'না পারলে?' রেণু হাসল, বোঝা যাচ্ছিল ওর কষ্ট হচ্ছে একটু, 'আমায় কোলে নিয়ে যেতে পারবে?'

'উপায় না থাকলে করতে হবে।' সুমিত দেখল সামনেই নদীর বুকে একটা ছোট নৌকো জলে ভাসছে আর তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো ফোকলা গালে হাসছে। লোকটা নিশ্চয়ই রেণুকে পড়ে যেতে দেখেছে। সুমিতের রাগ হচ্ছিল লোকটার ওপরে কিন্তু লোকটা মুখের কাছে দু হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'খুব বেশি লাগেনি তো মা!'

নৌকোটা পাড় থেকে অনেকটা দূরে। বাতাসে শব্দটা অনেক ক্ষীণ শোনাল। রেণু দেখতে পেয়েছিল লোকটাকে, ঘাড় নেড়ে বলল, না। তারপর বলল, 'কেমন স্নেহপ্রবণ লোক, না?'

সুমিত কিছু বলল না। ও বুঝতে পারছিল না ভাঙা লাইটহাউসের দিকে আর যাওয়াটা ঠিক হবে কি না। চটি হাতে নিয়ে গোড়ালির ওপর ভর করে রেণু কতটা হাঁটতে পারবে? তা ছাড়া এর মধ্যে প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেছে। অশোক চারটের বাস ধরবে বলেছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হল ওরা এখন কী করছে? অশোক আর ঝুমা! ভাবতে গিয়েই ওর কান লাল হয়ে উঠল। ও রেণুর দিকে তাকাল। পড়ে যাবার পর রেণু এখনও অগোছালো হয়ে আছে, রেণুর বুক থেকে সরে যাওয়া কাপড় এখন হাতের ওপর বাতাসে দোল খাচ্ছে। চট করে চোখ সরিয়ে নিল সুমিত। রেণু যে কোনও যুবতী মেয়ের মতন পূর্ণতার সীমা পেরিয়ে গেছে। য়ুনিভার্সিটির শেষ গণ্ডি না পার হওয়া অবধি ওরা মেয়ে থাকে, নেহাত মহিলা হয়ে যায় না, এই যা।

রেণু বলল, 'তোমার খুব লজ্জা, না?'

'কেন?'

'চোখ সরিয়ে নিলে তো, তাই।' কাপড় ঠিক করে রেণু বলল, 'কই বললে না তো আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে কি না।'

কী বলতে গিয়ে সুমিত হেসে ফেলল, 'যা একখানা চেহারা করেছ, রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন, তোমার ও বডি যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি—আমি হেলপলেস।'

হেসে উঠল রেণু, 'তা হলে আমি তোমার কাঁধে ভর করলাম, একটু হেলপ করো না হয়।' রেণু একটা হাত সুমিতের কাঁধের ওপর পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে দিল। সুমিত রেণুর কোমরের কাছে আলতো করে হাত রেখে ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল লাইটহাউসের দিকে। এখন রেণুর শরীর ওর সঙ্গে

মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ওর হাতের তালুর তলায় রেণুর কোমরের একরাশ মাখন কী উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। ওর দমবন্ধ হয়ে আসছিল, রেণুর শরীর থেকে এক লক্ষ কস্তুরী হরিণ বেরিয়ে আসছে তাদের মাতাল সুবাস নিয়ে। বুকের পাশে হঠাৎ হঠাৎ ফুলের তোড়ার মতো নরম স্পর্শ ওর রক্তে টোকা দিয়ে যাচ্ছিল। ওর মনে হল এইভাবে ও যদি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, এইভাবে।

জলে শব্দ তুলে নৌকোটা পাড়ের কাছে চলে এল। ওরা দেখল বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে বৈঠা বেয়ে একদম মাটির কাছে নৌকো ভিড়াল। ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুমিত রেণুর কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিল, দেখাদেখি রেণুও। নৌকোটা ছোট, একটা ভেজা জাল মাঝখানে পড়ে আছে। বুড়ো হাত জোড় করে হাসল, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

বিরক্ত হতে পারত সুমিত। কিন্তু লোকটার কথা বলার ধরন, হাতজোড় করে নমস্কার করা এই সব ওর কণ্ঠস্বরকে নরম করতে সাহায্য করল, 'ওই ভাঙা লাইটহাউসে যাব।' তারপর সাফাই গাওয়ার মতন বলল, 'এমনি বেড়াতে।'

ঘাড় নাড়ল বুড়ো, 'ওটার সিঁড়িটা গেল বছর কলকাতার কিছু মেয়ে মদ্দ এসে ভেঙে রেখেছে। তুমি মা উঠতি পারবা না।' তারপর রেণুর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাটারে তো জখম ভালমতোই করিছো, হাঁটতি পারবা?'

সুমিত হেসে ফেলল, 'কী আর করা যাবে?'

'তা আসা হচ্ছে নিশ্চয় কলকাতা থেকে, লয়?' বুড়োর দাড়ি বাতাসে দুলছিল। চোখ দুটো সুমিতের দিকে। সুমিত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'তা আমি বলি কী, মায়ের যখন এই অবস্থা, আমারে দুটো ট্যাকা যদি দাও তোমাদের লৌকাবিলাস করিয়ে দিতে পারি।' বলে বুড়োর যেন খুব মজা লেগেছে এমন করে মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

'নৌকো করে। বাঃ, দারুণ হবে। এই চলো না।' রেণু খুশিতে সুমিতের হাত ধরল। সুমিতের প্রস্তাবটা আশাতীত মনে হচ্ছিল। অন্তত হোটেলের ঘাটে নৌকো করে গেলে রেণুকে হাঁটতে হবে না। ও একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'আমরা কিন্তু ওই যে বড় হোটেল বাড়ি, ওখানে যাব, নামিয়ে দেবে তো?'

'ঠিক আছে বাবা।' লোকটা নেমে পড়ল মাটিতে, নেমে নৌকোর একটা দিক শক্ত করে ধরল। আলপথ থেকে ওরা সাবধানে নীচে নেমে এল। রেণু ঢালু মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে সুমিতকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। ওর শরীর ভয়ে কাঁপছে টের পেল সুমিত। একটা পা নৌকোয় রাখতেই নৌকো দুলে উঠল 'ডুবে যাবে না তো।' রেণু আঁতকে উঠল।

'কত তুফান গেল মা, এ নৌকোর প্রাণ কাছিমের মতো শক্ত।' বুড়ো বলল। শরীরের ভার ঠিক রেখে সুমিত রেণুকে তুলে নিল নৌকোয়, নিয়ে মাঝখানে গুছিয়ে বসল। বুড়ো এবার নৌকো বৈঠার ডগা দিয়ে পাড় থেকে ঠেলে সরিয়ে আনল, তারপর এক প্রান্তের গলুই-এ বসে বৈঠা বাইতে লাগল চুপচাপ।

প্রথমটায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলেও এক সময় রেণু সহজ হল। দুপাশে জলের দাগ রেখে নৌকোটা মাঝ নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জলজ বাতাস ওদের শরীরে ঠাণ্ডা আমেজ আনছিল, যদিও রোদ এখনও চারধারে ছড়িয়ে আছে। নৌকো থেকে আঁশটে গন্ধ উঠছে, বোধহয় জালের তলায় ধরা মাছ রাখা আছে। বুড়ো মাঝে মাঝে তার পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিল। পাকা দাড়ি লম্বা হলেই সুমিতের রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে।

একসময় ওপাশের ধানক্ষেত অনেকটা দূরে সরে গেল। ডানদিকে ভাঙা লাইটহাউস আর বাঁদিকে অস্পষ্ট হোটেলবাড়িটা দেখা যাচ্ছে। আশে-পাশে দু'একটা জেলে নৌকো ভাসছে। মাঝনদী দিয়ে একটা ছোট জাহাজ যাচ্ছে গম্ভীর মাছের মতো। তার ঢেউগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এত দূরে এসে ওদের নৌকোকে দোল দিয়ে যাচ্ছে। রেণু নড়েচড়ে বসল। তারপর এক হাতে সুমিতকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে ঝুঁকে পড়ে জল স্পর্শ করল, 'আঃ, দ্যাখো কী ঠাণ্ডা।'

আর ঠিক তখনই সুমিতের মনে পড়ল ওর কুষ্ঠিতে জলে ডুবে মৃত্যু হবার একটা ফাঁড়ার কথা লেখা আছে। ছেলেবেলা থেকে এই ভয়ে ওর সাঁতার শেখা হয়নি। মুখ ঘুরিয়ে সুমিত বলল, 'বেশি ঝুঁকো না, নৌকো উলটে যাবে।'

সেই সময় বুড়ো বলল, 'না, না, মা আমার পাখির মতো হালকা। হাতটা ধুয়ে নিলে হয়, মাটি লেগে আছে।'

রেণু কনুই ঘুরিয়ে দেখল। তারপর জল তুলে তুলে ধুয়ে নিল হাতটা। সুমিত রেণুর কোমরের কাছে হাত রেখে সামনে পা ছড়িয়ে দিল। আঃ! হঠাৎ ওর নজর পড়ল বুড়োর ওপর, একদৃষ্টে চেয়ে আছে রেণুর দিকে। কী দেখছে লোকটা? ওর হঠাৎ মনে হল, এই সব মাঝিরা ইচ্ছে করলেই শয়তানি করতে পারে। যদিও বয়স হয়েছে ওর, তবু জলের ওপর ও এখন ওদের ভয় দেখাতে পারে, টাকা পয়সা ছিনতাই করতে পারে। এখন প্রায় মাঝনদীতে এসে পড়েছে ওরা, চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। ও ভাবল রেণুকে একটু সাবধান করে দেয়, কিন্তু ও অবাক হয়ে শুনল, রেণু গুন গুন করছে জলের দিকে তাকিয়ে। জলের গায়ে রেণুর কাঁপা কাঁপা ছায়াটা পাশাপাশি চলছিল। একটা মাছধরা পাখি ঠিক মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে গেল আচমকা। বুড়ো এখন আর বৈঠা বাইছে না, হালের মতো ধরে আছে। হঠাৎ নরম নরম গলায় ও বলল, 'মা যদি দোষ না নেয় তবে বলি একটু জোরেই হোক না কেন, সুখ বলো আর দুঃখই বলো মনের মধ্যে বন্দি রাখতি নেই।' ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল রেণু, তারপর হেসে ফেলল। বলল, 'আমার মুড এসে গেছে, এই তুমি হাসবে না বলো?'

'আমি চোখ বন্ধ করে আছি।' সুমিত বলল।

একটা চিমটি কাটল রেণু ওর হাতে। তারপর নদীর ওপর চোখ রেখে গেয়ে ফেলল, 'সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।' এর আগে কখনও রেণুর গান শোনেনি সুমিত। মাঝে মাঝে পথ চলতে একটু গুনগুন করেছে এইমাত্র। এখন এই খোলা নদীর বুকে নৌকোয় বসে সারা শরীরে বাতাসের স্পর্শ নিয়ে কুচি কুচি কাগজের মতো জলের ফেনা দেখতে দেখতে ওর মনে হল রেণু খুব দুঃখী, দুঃখ না থাকলে কেউ এই সুন্দর গান গাইতে পারে না। এত ভালবাসার কথা তবু গানের ভিতর থেকে এক বিষণ্ণ মেজাজ এসে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। রেণু যখন গাইল, 'আমার মতো সুখী কে আছে। আয় সখী, আয় আমার কাছে' তখন অদ্ভুত একটা কান্না শামুকের মতো মুখ চোখ বন্ধ করে বসেছিল। এক সময় যখন গান শেষ হয়ে গেল, যখন সব চুপচাপ, শুধু বুড়ো বৈঠা ধরে আস্তে আস্তে নাড়ছে তখন সুমিতের মনে হল একটাই লাইন ঘুরে ফিরে বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফিরে ফিরে আসছে—ভালবাসা কারে কয়! সুমিত রেণুর হাত শক্ত করে মুঠোয় আঁকড়ে ধরল।

হোটেলের ঘাটে নেমে সুমিত বুড়োকে দুটো টাকা দিল। টাকাটা কেমন নিস্পৃহের মতো নিয়ে বুড়ো বলল, 'আর তো দেখা হবে না বাবু।'

সুমিত ভাবল ও আরও টাকা চাইছে, বলল, 'ঠিক আছে, আবার যদি আসি তখন তোমার নৌকোয় চড়ব।'

'আমি তো থাকব না' বুড়ো ঘাড় নাড়ল, 'এই শীতেই আমি মরে যাব, কাকদ্বীপের ফকির গুনে বলেছে।' বলে বুড়ো নৌকোটা জলে নিয়ে গেল পাড়ে বৈঠা ঠেলে। সুমিত চমকে উঠেছিল কথাটা শুনে, কী সাধারণ গলায় লোকটা বলে গেল ও মরে যাবে। রেণু একটু এগিয়ে গিয়েছিল, পিছন ফিরে ডাকল, 'এই!' খুব খারাপ লাগছিল সুমিতের, ও তাকিয়ে দেখল নৌকোটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে আর বুড়োর মুখটা নদীর দিকে ফেরানো, এখান থেকে বাতাসে ওর সাদা দাড়ির প্রান্ত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। রেণু আবার ডাকল।

হোটেলের সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিল। সুমিতদের দেখেই অশোক ঘড়ি দেখল, 'ক'টা বাজে খেয়াল আছে? কোথায় ঘুরছিলি!'

সুমিত দেখল অশোককে বেশ চকচকে দেখাচ্ছে, মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো। স্নান করার পর শরীরে যে জৌলুস আসে এখন অশোককে দেখলে তা বোঝা যায়। দুটো রিকশা সামনে দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে অশোকই ওদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ঝুমা এক পায়ে ভর রেখে শরীরটা ঈষৎ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখাচোখি হতেই হাসল। চমকে উঠে রেণুর দিকে তাকাতেই রেণু মুখ ফিরিয়ে হোটেলের দিকে তাকাল। শাড়ি বদলেছে ঝুমা, খুব পাতলা একটা গা-পিচ্ছিল শাড়ি পরেছে এখন। টকটকে লাল। শেষ বিকেলের রোদ সেটাকে আরও লকলকে করে তুলেছে। হাতকাটা জামা পরায় চোখের দৃষ্টি ওর নিটোল ফরসা হাতের ডানায় গিয়ে পড়বেই। য়ুনিভার্সিটিতে কোনও মেয়েকে নাভির

তলায় শাড়ি পড়তে দ্যাখেনি ও। এখন ঝুমা পরেছে। কিন্তু কোমরের ওপর ওর নিয়মিত শাড়ির বাঁধুনির দাগ চোখে পড়ে গেল সুমিতের। ঝুমাকে কি খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে? ওর মনে পড়ল ওদের হোস্টেল লাইব্রেরিতে আবুল হাসনাতের মোটকা বইটা এসেছে—পড়ে দেখতে হবে।

দুলে দুলে ঝুমা রেণুর কাছে এগিয়ে এল, 'কী ভাই, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, না?' রেণু অবাক হল, 'মানে?'

'কাপড়টার কী অবস্থা করেছ, যে দেখবে সেই বুঝবে।' ঝুমা হাসল।

'বুঝুক।' রেণু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রিকশায় উঠে বসল। সুমিত লক্ষ করল ও আঙুল কেটে যাওয়ার ব্যাপারটা বলল না। সুমিত ভেবেছিল এখানে ফিরে এসে হোটেল থেকে ওষুধ চেয়ে নিয়ে রেণুর পায়ে লাগিয়ে দেবে। কিন্তু এখন রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল রেণু চায় না যে, এটা ঝুমারা জানুক।

অশোক দাম মিটিয়ে দিয়েছিল। যা খরচ হবে কলকাতায় ফিরে শেয়ার হবে। অবশ্যই ঘর ভাড়া নেবার টাকাটা ওরাই দেবে। ঝুমা গিয়ে রেণুর রিকশায় উঠল। উঠে বলল, 'এবার আপনারা দুই বন্ধু একসঙ্গে যান।' ওদের রিকশাকে আগে যেতে দিয়ে অশোক একটা সিগারেট দুবারের চেষ্টায় ধরিয়ে বলল, 'খাবি?' ঘাড় নাড়ল সুমিত, না। চোখ বন্ধ করে একমুখ ধোঁয়া টেনে অশোক বলল, 'বুঝলি সুমিত, দা-রু-ণ।'

সুমিত কোনও কথা বলল না। ও দেখল নদী থেকে ক্রমশ দূরে চলে আসছে ওরা। এখন ভরা বিকেলে নদীর ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসা ছায়ায় ছোট ছোট নৌকোগুলোকে আলাদা করে চেনা কঠিন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সেই দাড়িওয়ালা বুড়োকে দেখবার চেষ্টা করল ও। এখন সব অস্পষ্ট।

মনুমেন্টের তলায় ওরা যখন ফিরে এল তখন রাত হয়ে গিয়েছে। বাসে বসেই রেণু ছটফট করছিল। ফেরার সময় ভিড় ছিল খুব। কথা বলার সুযোগ ছিল না একদম। রেণু মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিল। বাস থেকে নেমে রেণু বলল, 'আজ কপালে কী আছে কে জানে!'

সুমিত বলল, 'পৌঁছে দিয়ে আসব?'

রেণু ঘাড় নাড়ল, 'মাথা খারাপ। একাই চলে যাব।'

অশোক বলল, 'চল ট্যাক্সি করি।' অশোক থাকে ঢাকুরিয়ায়। ওদের যেতে হবে একই দিকে। রেণু বলল, 'না না ট্রামেই চলে যাব।' অশোক ঝুমার কাছে গিয়ে নিচু গলায় কী বলতে ঝুমা হেসে উঠল। রেণু বলল, 'চলি।'

সুমিত বলতে চাইছিল ও কোনওদিন আজকের কথা ভুলবে না। কিন্তু ও বলল, 'কাল আসছ তো।'

এগিয়ে আসা একটা ট্রামের দিকে তাকিয়ে রেণু বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'সকালে ভেবেছিলাম আমি ঝুমার মতো হব। কিন্তু পারলাম না, তুমি খুব ভাল, খু-উ-ব।' ট্রামটা এসে দাঁড়াতেই রেণু উঠে পড়ল। সুমিত দেখল অশোকও ট্রামটায় উঠছে, 'সুমিত, তুই তো নর্থে যাবি, ওকে পৌঁছে দিস।' কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অশোক চলে গেল।

ট্রামটা চলে গেলে সুমিত দেখল অন্ধকারে ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশে দুটো লোক ঘুরঘুর করছে। লোক দুটোর ভাবভঙ্গি ভাল নয়। সুমিতকে দেখে ওরা সরে দাঁড়াল। সুমিত বলল, 'চলুন।'

ওরা চৌত্রিশ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের সামনে এসে দাঁড়াল, বেশ লোক জমে গেছে, বাস নেই। ঝুমা বলল, 'আপনি হেঁদোর কাছে থাকেন না?'

সুমিত ঘাড় নাড়ল। ঝুমা গ্রে স্ট্রিটে থাকে, অশোক ওকে বলেছে। 'ট্রামে গেলেও তো হয়।' সুমিত বলল।

'ট্যাক্সি দেখুন না, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। টায়ার্ড।' ঝুমা গলাটা ক্লান্ত করে বলল। সুমিত ঝুমার দিকে তাকাল। ঘুম পায় না কি, কে জানে? ওরা এগিয়ে এল মেট্রোর কাছাকাছি। সুমিত বলল, 'ট্রামে গেলেই হত, শুধু শুধু খরচ করে লাভ আছে।'

'ইস, আপনি তো দারুণ কিপ্টে।' ভ্রূকুটি করল ঝুমা।

'পয়সা পেলে তো কিপ্টেমি করব।' হাসল সুমিত।

'আপনাকে কে দিতে বলেছে, আপনার বন্ধুকেও আমি খরচ করতে দিই না।'

একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। ট্যাক্সিতে উঠে সুমিত দেখল সেই লোক দুটো পিছন পিছন এত দূরে এসেছে। কেন? ধর্মতলায় সন্ধের পর একধরনের মেয়ের পিছনে এইসব লোকগুলো ঘোরাফেরা করে। ঝুমাকে ওরা কী ভেবেছে।

মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান রেখে সুমিত বসেছিল। ঝুমা শরীর এলিয়ে দিয়েছে জানলার ধারে। হঠাৎ ও বলল, 'রেণু খুব ঠাণ্ডা মেয়ে না!'

'ঠাণ্ডা মানে?' সুমিত প্রশ্নটা বুঝতে পারল না।

'শীতল।' আস্তে করে বলল ঝুমা। এবার ধরতে পারল ও একটা রুক্ষ কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলল, 'ঠিক ভাবিনি।'

'ভেবে দেখবেন।' ঝুমা মুখ ফেরাল রাস্তার দিকে, 'ওকে সবাই খুব অহংকারী মেয়ে বলে, অবশ্য ওর কলেজের বন্ধুরা বাদে, তারা অন্য কথা বলে।'

'কী কথা?' সুমিতের মজা লাগছিল।

'শরীর আর মন, এই দুটোর চেহারা, পরস্পরের ওপর নির্ভর করে না। ছেড়ে দিন এ সব। একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি, কথা ঘুরালো ঝুমা। কিছু বলল না সুমিত। ঝুমা কীসের ইঙ্গিত করছে? অর্থাৎ রেণুর শরীর দেখে ওর মনের বিচার করা ভুল—এটাই কি ও বলতে চাইছে। মনে মনে বিরক্ত হল ও ঝুমার ওপর। অকারণে অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে কেউ কেউ সুখ পায়। অথচ আজ যে কর্মটি ও অশোকের সঙ্গে করে এসেছে তার জন্য কোনও লজ্জা বা সংকোচ ওর ব্যবহারে নেই। বলতে গেলে ঢাক পিটিয়েই ওরা জিনিসটা করল। যেন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার আর তাই বলতে দ্বিধা হচ্ছে না যে খুব টায়ার্ড, ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎ এক ধরনের ঘেন্না হল সুমিতের। ঝুমা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কই, বললেন না তো আসবেন কি না!'

'দেখি।'

'দেখি না, আসতেই হবে, আপনাকে অনেক খবর দেব। এই যা, আপনার হেঁদো এসে গেছে।' আফসোসের গলায় বলল ঝুমা। সুমিত দেখল ওদের ট্যাক্সি প্রায় হেঁদো পেরিয়ে যাচ্ছে। থামিয়ে নেমে পড়ল ও, 'আপনি একা একা যেতে পারবেন তো!' ঝুমা সরে এল জানালায়, 'এইটুকু তো পথ। শুনুন, মাথাটা নামান, রেণুর কাছে আমি খুব খারাপ হতে পারি, কিন্তু আমিও তো মেয়ে, মেয়ে না—বলুন?' তারপর সোজা হয়ে বলল 'আসবেন কিন্তু।'

ট্যাক্সিটা চলে যেতে সুমিত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ঝুমার এইসব ব্যবহার ওর কাছে কেমন রহস্যের মতো মনে হচ্ছে। ঝুমাকে ওই ধরনের ইঙ্গিতময় কথা বলতে ও কোনওদিন শোনেনি। বিয়ের পর মেয়েদের বুদ্ধি বেড়ে যায়, কথাবার্তায় ধার আসে। আজকের ব্যাপারের পর ঝুমাও কি—হেসে ফেলল সুমিত। আরে তা না, আসলে মেয়েরা এইরকমই, ওদের শরীরের মতো মনের রহস্যের কূল নিজেরাই পায় না—কোথায় যেন পড়েছিল সুমিত। ভাগ্যিস পায় না।

নটার মধ্যে মেস থেকে বেরিয়ে পড়ে সুমিত, এই সময় ট্রাম ফাঁকা থাকে, আরাম করে অফিসে যাওয়া যায়। আজ খুব মোটা আর বড় তালা ঘরে দিয়ে এল ও। চাকরটাকে ডেকে বলল নজর রাখতে। মেসের কয়েকজন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিছু খোওয়া গিয়েছে কি না, ও তেমন কিছু নয় বলে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল একটা—যদি আবার কেউ এসে পড়ে আর চিঠিটা যদি সে পেয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে কোনও কারণে চিঠির মূল্য কারও কারও কাছে বেড়ে গেছে। কারণটা জানবার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল ওর। কালকের লোকটা যা বলে গেল তাই কি সব? রেণুর সঙ্গে কতকাল দেখা হয়নি, কতকাল। বিয়ের পর একবার এসেছিল ও, তখনই জোর করে অফিসের ফোন নাম্বার নিয়ে গেছে। রেণুই কি তাকে ফোন করেছিল। চিঠিটা সঙ্গে নেবার কথা ভাবল একবার, কিন্তু সেটা নিরাপদ নয়।

ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতেই ও দেখল কালকের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। রাগে গা রি রি করে উঠল সুমিতের। ওকে লক্ষই করেনি এমন ভঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল ও। লোকটা সামনাসামনি হতেই হাত জোর করে নমস্কার করল, 'কালকে আপনাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি স্যার, আমার

নাম ব্রজবিলাস গুপ্ত।'

যেন কালকে রাত্রে ওর মনে পড়ছে নাম বলা হয়নি তাই আজ আসা এইরকম ভাব আর কী! দাঁতে দাঁত চেপে সুমিত বলল, 'কী চান?'

'কেন রাগ করছেন স্যার, চিঠিগুলো—।' লোকটা হাসতে যাচ্ছিল, সুমিতকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ বন্ধ করল।

'আপনাকে শেষ বার বলে দিচ্ছি আমাকে বিরক্ত করবেন না। সুমিত বেশ জোরেই কথাগুলো বলল।

'আপনি যদি অপছন্দ করেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে রেণুদেবী আপনার উপর দেখলাম ভীষণ খাপ্পা। কাল রাত্রে ওঁর বাবা এসে ওকে নিয়ে গেছেন কদিনের জন্য।' সুমিত লক্ষ করল আগের কথার সঙ্গে পরের কথার মিল নেই। ও দ্রুত পা চালাল। ডালহৌসির একটা ট্রাম আসছে। ব্রজবিলাস পেছন পেছন ছুটতে বলল, 'আমি স্যার অফিস ছুটির পর দাঁড়িয়ে থাকব, আপনি চিন্তা করে নেবেন।'

ট্রামে উঠে বসার জায়গা পেল ও। ব্রজবিলাসকে রেণুর স্বামী রোজ পাঠাচ্ছে। তা হলে কাল যারা এসেছিল তারা কে। তারা নিশ্চয়ই আরও সাহসী, ঘর তছনছ করতে ভয় পায়নি। রেণুর স্বামী কি ওদেরও পাঠিয়েছিল? ভদ্রলোককে কোনওদিন দ্যাখেনি সুমিত। খুব বড়সড় চাকরি করেন এইটুকু শুনেছে ও। বয়সে ওদের চেয়ে বেশ বড়। য়ুনিভার্সিটির সামনে দিয়ে ট্রামে যেতে যেতে সুমিত দেখল দুটি ছেলেমেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথ ধরে। রেণুকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওর, ভীষণ।

অফিস থেকে বেরিয়েই কিছুই করার থাকে না। মাঝে মাঝে জুলজিকাল সার্ভে অফিসে যায় ও, সেখানে কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, রামিটামি খেলা হয়। অশোক এতদিন বাইরে ছিল এখন কলকাতায় এসেছে ট্রান্সফার নিয়ে জুলজিকাল সার্ভেতে। ওর মাধ্যমেই ওখানে চেনাশোনা। অফিস ছাড়ার সময় ও ভেবেছিল ওখানেই যাবে। রায়সাহেব, অশোকদের রায়সাহেব, অফিসের পাশেই থাকেন। তার ফ্ল্যাটেই খেলা হয়।

আজ সারাটা দিন কান খাড়া রেখেছিল ও। না, কোনও ফোন আসেনি। ও খুব আশা করেছিল যে শনিবার ওকে ফোন করেছিল সে আজও করবে। মেয়েরা এই রকম বোধ হয়, কাউকে অস্বস্তিতে রেখে দিতে ভালবাসে। অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইন ধরে হাঁটছিল সুমিত। রাজভবনের পাশ দিয়ে ফাঁকায় হেঁটে রায়সাহেবের ফ্ল্যাটে যেতে বেশি সময় লাগে না। দু-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখেছে ব্রজবিলাস এসেছে কি না। শালাকে আজ ভাল করে সমঝে দিতে হবে। রাজভবনের এ দিকটা ফাঁকা। আনমনে হাঁটছিল সুমিত হঠাৎ চোখ তুলে দেখল সামনে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ওর কেমন অস্বস্তি হল। ছেলে দুটো কোমরে হাত রেখে ওকে দেখছে। চোখের দৃষ্টি ভাল নয়, চোয়াল শক্ত, ভাঙা গাল মুখটাকে কর্কশ করে তুলেছে দুজনেরই। ও দেখল পেছনে আরও কয়েকজন এসে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আচমকা একটা ভয় ওর বুকের মধ্যে পাক খেয়ে গেল। এ দিকটা একদম ফাঁকা, শুধু আকাশবাণীর সামনে দিয়ে গাড়ির স্রোত যাচ্ছে। ক্রমশ বৃত্তটা ছোট হয়ে এল। দু-একজন যারা এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা ব্যাপারটা না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে। সুমিত অসহায়ের মতো তাকাল। এই মুখগুলো ওর অচেনা আর দেখলেই বোঝা যায় দয়া মায়া প্রভৃতি শব্দের কথা এরা কোনওকালেই শোনেনি। ঠিক মুখোমুখি যে দাঁড়িয়েছিল সুমিত তার দিকে চেয়ে কোনওরকমে বলল, 'কী চাই আপনাদের?'

যেন এইরকম কথার জন্য ওরা অপেক্ষা করেছিল। পলকে সুমিত দেখল ছেলেটি পেছনে শরীর বেঁকিয়ে ওর মুখের দিকে ঘুষি মারছে। ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে সুমিত মাথাটা সামান্য সরাতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাতে ও টলে উঠল। ঠিক সেই সময় একটা হাত ওর জামার কলার চেপে ধরে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিতেই ওর মনে হল ওর কোমর ভেঙে গেছে। পর পর কয়েকটা লাথি এসে পড়ল কোমরে। সুমিত চিৎকার করে বলল, 'কী করছেন কী আপনারা—আপনাদের আমি চিনি না—।' যে ছেলেটা প্রথম ঘুঁষি মেরেছিল সে এবার সুমিতের বুকের জামা খিমচে ধরে মুখ কাছে নিয়ে এল, 'চেনো না, শালা বদমাশ, ব্ল্যাকমেল করার ধান্দা, তোমাকে শালা আজ জ্যান্ত পুঁতব।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত চোখে অন্ধকার দেখল। ছেলেটি ওর কপালের ওপর এবারে

ঘুঁষি মারতে পেরেছে। যেহেতু ওর জামা ছেলেটির হাতে ধরা ছিল ও পড়ে গেল না। ব্ল্যাকমেল, ব্ল্যাকমেল—সুমিত মনে মনে শব্দটা নিয়ে হাতড়াচ্ছিল। 'চিঠিটা কেন দিয়েছ? টাকার জন্য? শালা আজ তোমাকে বাপের বাসি বিয়ে দেখাব।' ছেলেটা আবার হাত তুলতেই সুমিত মাটিতে পড়ে গেল। ওর চারপাশে গাছপালার মতো কতগুলো পা যার ফাঁক দিয়ে দূরে দাঁড়ানো সুভাষচন্দ্রকে দেখতে পাওয়া গেল। হঠাৎ একটা ঘোরের মধ্যে সুমিত শুনল, 'এই গুপি, হয়েছে আর নয়, তোমাদের আমি এ ভাবে ট্যাকল করতে বলিনি, ছেড়ে দাও।'

'না দীপকদা, এ শালাকে ভাল করে বানাতে দিন। আপনার বোনের ইজ্জত মানে আমাদের ইজ্জত।' গুপীর গলা শুনল সুমিত।

'কিন্তু মেরে কী হবে, আমার চিঠিটা চাই, ও মরে গেলে ব্যাপারটা জানা যাবে না সেটা বেহাত হয়ে গেছে কি না। ছেড়ে দাও।'

গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, সুমিত দেখল ওর চারপাশের পায়ের সারিগুলো আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ একটা মুখ ওর দিকে নিচু হয়ে এল, 'ব্যাপারটা এ-ভাবে হোক আমি চাইনি, বুঝতে পারছেন বয়স কম ওদের অল্পেই উত্তেজিত হয়।'

সুমিত মাথা তুলে লোকটাকে দেখল। ফরসা চেহারা। নাক-চোখ-মুখ সুমিত চোখ বন্ধ করেই আবার খুলল, রেণু দাঁড়িয়ে আছে—অবিকল রেণু—সেই চোখ কপাল চিবুকের আদল—না, রেণু নয়। সুমিত চোখ খুলে রাখতে পারছিল না। 'আমি বুঝতে পারছি এখন আপনার পক্ষে মন ঠিক করে কথা বলা সম্ভব নয়, আজ রাত্রে আপনার মেসে যাব।' হাত ধরে ওকে তুলে বসালেন ভদ্রলোক, 'ক্ষমা চাইছি ব্যাপারটার জন্য।'

'দীপকদা, কুইক।' সুমিত কতকগুলো পায়ের দ্রুত চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। ফুটপাথে বসে মাথা দু হাতে চেপে ধরে ও চোখ খুলল, একটা কালো ভ্যান আকাশবাণীর দিক থেকে এসে ময়দানের দিকে চলে গেল। সুমিতের মাথা ঘুরছিল। এখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। আলো জ্বলছে ময়দানে। কয়েকজন পথচারী ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিল। সুমিত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কোমরের কাছে অসহ্য যন্ত্রণা, ঠোঁটের ওপর চটচটে গরম কী একটা লাগতেই ও জিভ বোলাল। নোনতা নোনতা স্বাদ। বাঁ চোখটা দ্রুত ফুলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি বেশ দ্রুত এসে প্রায় ফুটপাথে ঘেঁসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। সুমিত দেখল কেউ লাফিয়ে নামছে। আবার ওরা এল না কি! দুটো হাত ওর কাঁধের ওপর আলতো করে রেখে ওকে তুলে ধরার চেষ্টা করল, 'স্যার, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, আমি ট্যাক্সি এনেছি।' এরকম অবাক সুমিত জীবনে কখনও হয়নি। এক চোখে কোনও রকমে ও দেখল ব্রজবিলাসের মুখ কেমন দুঃখী দুঃখী। নাকি শালা গোঁফের নীচে হাসছে! ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু এ শালা কোত্থেকে এল! দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ব্রজবিলাস ট্যাক্সির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর মাথা সুমিতের বুকের কাছে। সুমিত কোনওরকমে ট্যাক্সিতে উঠে মাথা হেলিয়ে দিল পিছনের সিটে। শব্দ করে দরজা বন্ধ করে ব্রজবিলাস বলল, 'হেঁদুয়া চলিয়ে সর্দারজি।'

মাথায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে। সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা, সুমিত ঘাড় ঘোরাল। প্রথম এই অবস্থায় মেসে গেলে সবাই প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আজ অফিসের দিন, মেস এখনও খালি। কিন্তু তার আগে একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। ও দেখল ব্রজবিলাসের মুখ ওর দিকে ঝুঁকে এসেছে, 'ব্যাটারা একটুও বাদ রাখেনি, মুখটাকে কী করে দিয়েছে, ইস।'

সুমিত কোনওরকমে পকেট থেকে রুমাল বের করতেই ব্রজবিলাস খপ করে ওর হাত থেকে সেটাকে নিয়ে নিল, 'রক্ত, কত দুধের ফোঁটায় এক রত্তি রক্ত হয়—রক্তখাকি মেয়ে—ঠিক করেছেন স্যার, বাধা দিলে ওরা মেরে ফেলতে পারত।' আলতো করে রুমাল বুলিয়ে ওর মুখের রক্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছিল ব্রজবিলাস, ব্যাটা নিশ্চয়ই বক্সার, কেমন লো কাট একটা ঝাড়ল—ছবির মতো দেখলাম।

মুখ সরিয়ে নিল সুমিত, 'আপনি চুপ করুন তো।'

'না স্যার, এখন কথা বলবেন না। ওরা হল শত্রুপক্ষ, আপনার এবং আমার। ট্যাক্টফুলি সব করতে হবে এখন। আমি বলি কী আপনি আমার সঙ্গে কোঅপারেশন করুন, শালারা তা হলে পারবে না। আর

ওই যে লোকটা প্রথমে লেলিয়ে দিয়ে পরে বাস ধরল, ওই হল রেণুদেবীর দাদা—এক নম্বরের মতলববাজ। আধমরা করে তবে পিরিত দেখাতে এসেছে, একদম বিশ্বাস করবেন না। যাবার আগে কী বলে গেল স্যার?' চটেচটে রুমালটা সুমিতের দিকে এগিয়ে দিল ব্রজবিলাস। বাঁ হাতে সেটাকে নিয়ে সুমিত দেখল এটা আর ব্যবহার করা চলে না। হাত বাড়িয়ে বাইরে ফেলে দিতেই হাঁ হাঁ করে উঠল ব্রজবিলাস, 'আ হা হা—ফেলে দিলেন, দশ পয়সার সাবান ঘষলেই পরিষ্কার হয়ে যেত—নগদ দুটো টাকা রাস্তায় ফেলে দিলেন। বুঝতে পেরেছি, খুব শক পেয়েছেন—যা হারামজাদা মেয়েছেলে। তুই কি না এককালে যার সঙ্গে রং করতিস তাকেই মার খাওয়ালি! ছি ছি ছি।'

সোজা হয়ে বসল সুমিত, 'কী চাই আপনার?'

সুমিতের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর বদলে গেল ব্রজবিলাসের, 'স্যার ওই চিঠি যতক্ষণ আপনার কাছে আছে ওরা ছেড়ে দেবে না। আপনি বরং আমাকে দিয়ে দিন, কাজ হয়ে গেলেই ফেরত পাবেন। আর নগদ টাকা—।'

শরীরে একটু শক্তি ফিরে আসছিল, সুমিত ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল। হ্যারিসন রোডের কাছে ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই ও হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল, 'নেমে যান।'

ভীষণ রকম অবাক হয়ে ব্রজবিলাস বলল, 'স্যার!'

ধমকে উঠল সুমিত, 'নেমে যান—গেট আউট।'

'যাচ্ছি স্যার—ট্যাক্সিটা আমিই—স্যার আপনাকে মেসে পৌঁছে—আচ্ছা আচ্ছা—। সুমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে সুড়ুৎ করে নেমে গেল ব্রজবিলাস। দরজা বন্ধ করে ও ড্রাইভারকে চলতে বলল। গাড়িটা এগোতে শুরু করতেই ব্রজবিলাস দৌড়ে এল পাশে, 'স্যার, একটু চিন্তা করে নেবেন, আমি আবার আসব—স্যার!'

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল সুমিত, বড় কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট।

ভাগ্যিস রাত হয়ে গিয়েছিল এবং ওদের মেসের করিডোরের আলোর বদনাম আছে, সুমিত ডাক্তারের চেম্বার ফেরত সোজা নিজের ঘরে চলে এল, কেউ ওকে তেমন লক্ষ করেনি। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে যে ডাক্তারখানায় এক ভদ্রলোককে চুপচাপ বসে থাকতে দেখত ও, আজ জানল তিনিই ডাক্তার যদিও তাঁর পসারপাতি তেমন নেই, তবু তার রসিকতা করার প্রবণতা আছে। দেখা হতেই ভদ্রলোক বললেন, 'প্রেম-ট্রেম করতে গিয়েছিলেন নাকি মশাই।'

এখন ওর মুখে দুটো ছোট জোড়াতালি, গোটা আটেক ট্যাবলেট গিলতে হবে ব্যথাগুলো মারতে আর কালকের দিনটা বিশ্রাম, অবশ্য জ্বর-ফর এসে গেলে কথাই নেই, বিশ্রাম বেড়ে যাবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও ব্যাপারটা ভাল করে ভাবল। মনে হচ্ছে অনেক দূরে এগিয়েছে। রেণু আর ওর স্বামী, মি. মুখার্জি, কী যেন নাম, বরেন মুখার্জি। হ্যাঁ এ রকমই তো বলেছিল রেণু—'বুঝল অনেক দূর এগোবে।' কিন্তু এর মধ্যে সুমিতকে জড়াবার কোনও দরকার ছিল না রেণুর। আজ পর্যন্ত রেণুর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাইনি—সুমিত মনে মনে বলল, ওই যে ছেলেটা যে ওকে মোক্ষম ঘুঁষিটা ঝাড়ল, গুপি, মুখ খিঁচিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেলার বলে গালাগালি দিয়ে উঠল কেন? তবে কি রেণু ভাবছে ওর চিঠি এতদিন ধরে আমি রেখে দিয়েছি ওর স্বামীর হাতে তুলে দেব বলে। ক্ষিপ্ত ছেলেগুলোকে এভাবে উত্তেজিত না করলে ওদের মুখের চেহারা ওই রকম হয়। ব্রজবিলাস বলেছে রেণু এখন বাপের বাড়ি গিয়েছে।

চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল সুমিত, হঠাৎ ভেজানো দরজায় শব্দ হল। কোনওরকমে উঠে বসতেই ও দেখল ওদের চাকর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে, 'এক বাবু এসেছেন।' কথাটা বলতে বলতে ওর চোখ সুমিতের মুখের ওপর আসতেই গোল গোল হয়ে গেল। কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধহয় কিন্তু সুমিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভেতরে নিয়ে এসো।'

সুমিত দেখল দীপকবাবু, হ্যাঁ একাই ঘরে ঢুকলেন। ও চাকরকে চলে যেতে বলে দীপকবাবুর দিকে তাকাল, ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মধ্যে, মুখের মধ্যে অপরাধী অপরাধী ভাব। ঘরে ঢুকেই দুহাত জোড় করলেন, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই, কিন্তু বিশ্বাস করুন সব কিছু আমার ইচ্ছে মতন হয়নি।'

সুমিত উত্তর দিল না। ও ইচ্ছে করলে লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে মেসের

সবাইকে ডেকে বলতে পারে, এই লোকটার সঙ্গীরা ওকে মেরেছে। কিন্তু তা হলে কিছুই জানা যাবে না, ওর রেণুর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছিল, রেণু কেন এমন করল, কেন? সুমিত বলল, 'বসুন।'

'ডাক্তার কী বলল?' একটা চেয়ার টেনে দীপক বসলেন।

'সেরে যাবে।' সুমিত দেখল কথাটা শুনে মুখ নিচু করলেন উনি। তারপর পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। সুমিত ঘাড় নাড়তেই নিজে একটা ধরালেন, 'আমার নাম দীপক, দীপক রায়। আমি রেণুর দাদা।'

'বুঝতে পেরেছি, আপনাদের মুখের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।' সুমিত বলল।

'আমি কেন এসেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সত্যি কথা বলতে কী এ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। বরেনের প্রভাব প্রতিপত্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ও চাইছে রেণুকে এমনভাবে বঞ্চিত করতে যাতে ওর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। রেণু আমার বোন, এটা আমি কী করে মেনে নিতে পারি বলুন?' দীপক মুখ তুলে সুমিতের ছবির দিকে তাকালেন।

'আপনার বোনের সব ব্যাপার যখন আপনি—' সুমিতকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, 'আমি জানি আপনি কী বলবেন। আসলে কী জানেন আমাদের বাড়িটা ছিল খুব রক্ষণশীল। বাবা মায়ের থেকে আমাদের দুই ভাইবোন অনেক দূর মানসিকতায় মানুষ। ও আমার চেয়ে অনেক বয়সে ছোট, কিন্তু ওর একমাত্র বন্ধু আমি। ও যখন ছেলেদের সঙ্গে মিশত তখন আমিই বলেছিলাম ভাল করে নিজেকে বোঝো তারপর যা ইচ্ছে করো আমি তোকে হেলপ করব। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল—'

'আমি কী করতে পারি?' সুমিত জানলার দিকে তাকাল।

'আপনি রেণুর চিঠি কী করেছেন?' দীপক সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন।

'আপনার কী মনে হয়?'

'বরেন রেণুকে দিনের পর দিন এক একটা নতুন নাম বলে বলত তোমার সব জেনে গেছি। সেইসব শুনে রেণু আমাকে একটা চিঠি লিখল সেটা আমি পাইনি। সেই চিঠির পরই বরেন রেণুকে টর্চার করতে আরম্ভ করল, আপনার নাম বলল, আর দুদিন আগে বলছে আপনি টাকা নিয়ে বরেনকে চিঠি দিয়ে দিচ্ছেন।'

'রেণু এটা বিশ্বাস করেছে?'

'মনে হয় সেই রকম। ও নাকি এর মধ্যে আপনাকে অফিসে ফোন করেছিল, আপনি ফোন ধরেননি। ঝুমা নামে একটি মেয়ে যে আপনাদের সঙ্গে পড়ত সেও ওকে কী সব বলেছে। মেয়েদের মন—।'

সোজা হয়ে উঠে বসল সুমিত। ঝুমা ওকে কিছু বলেছে? আশ্চর্যের বোধহয় শেষ থাকে না। ঝুমার সঙ্গে ওর কতদিন দেখা হয়নি, কতদিন! অথচ ঝুমা ওর সম্পর্কে রেণুকে কী সব বলে বসল।

হঠাৎ দীপক সোজা হয়ে বসলেন, 'আপনি রেণুকে কথা দিয়েছিলেন যে, বিয়ের পরও পাঁচ বছর ওর জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

সুমিত প্রথমে কোনও কথা বলল না। ওর হঠাৎ সেই রেণুর কথা মনে পড়ে গেল, যে রেণু ওকে বলেছিল, 'আমাকে তুমি ঘেন্না করো, ঘেন্না করো, ঘেন্না করো।'

'আপনি কখনও কাউকে ভালবেসেছিলেন দীপকবাবু।' হঠাৎ সুমিত বলল।

'বুঝতে পারলাম না—আপনি—।' হকচকিয়ে যান ভদ্রলোক।

'ফাঁসির আসামি, যে কোনওদিন গির্জায় যায়নি তাকেও আগের রাত্রে নম্র হয়ে বাইবেল শুনতে হয়, হয় না? দেখুন, রেণুর কথা আমার ইদানীং তেমন মনে পড়ত না। হঠাৎ হঠাৎ দেখে—এসব কাউকে বোঝানো যায় না। সেই রাত্রে রেণুকে আমি বলেছিলাম যে, আমি অপেক্ষা করে আছি। চিঠিগুলো ওর স্বামী হাতে পেলে বিচ্ছেদ সহজে হবে। এটা ওর ভালই হবে, আমি তো অপেক্ষা করেই আছি। কিন্তু সত্যি বলুন তো ও মুক্তি চাইছে কি না?' উত্তেজনায় সুমিত হাঁপাচ্ছিল।

দীপক কিছু বললেন না প্রথমটা তারপর উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ সুমিত নেমে দাঁড়াল, 'আপনারা আমার এই অবস্থা করেছেন রেণু জানে?'

মাথা দোলাল দীপক, 'আমি ওকে বলেছি, আমি অনুতপ্ত সুমিতবাবু।'

'রেণু শুনে কী বলল?' সুমিতের গলা কাঁপছে।

হাতটা নাড়লেন উনি, 'ছেড়ে দিন আমি আমার বোনকে আজও বুঝতে পারিনি সুমিতবাবু। তবে ওকে বিপদে ফেলবেন না, এই অনুরোধ।' মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ওদের কাঠের সিঁড়িতে ভদ্রলোকের পায়ের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল।

সাতদিন রেণুর কোনও খবর ছিল না। অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে সুমিত রোজ ক্লাসে গিয়েছে, রেণু নেই। অশোক হেসে বলেছে, 'তুই ভীষণ বোকা, আসছে না তো কী হয়েছে। দ্যাখ বিয়ে টিয়ে হয়ে গেল কি না। বিয়ে? মাথায় বেনারসির ঘোমটা দিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে আছে—এ দৃশ্য চোখের ওপর হঠাৎ হঠাৎ দেখত সুমিত। আর বুকের মধ্যে এক লক্ষ দমকল ছুটোছুটি শুরু করে দিত। শেষপর্যন্ত অশোকই খবর আনল রেণু জামশেদপুর গিয়েছে। ওর কে এক আত্মীয় থাকে সেখানে। সুমিতের ইচ্ছে হচ্ছিল ও সোজা জামশেদপুর চলে যায়, আহা ঠিকানাটা যদি জানত!

সাতদিন পর এক রবিবারে হোস্টেলে চুপচাপ শুয়েছিল ও। বাইরে শীত এসে যাওয়া রোদ্দুর। সিনিয়র ছেলে বলে ও আলাদা ঘর পেয়েছে। আর কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। ওদের দারোয়ান পাথর এসে দরজা ধাক্কা দিলে, 'এ সুমিতবাবু, দরজা খুলিয়ে।'

দুপুরবেলায় ও আসে মানি অর্ডারের ফর্ম লেখাতে প্রত্যেক মাসে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই থতমত হয়ে গিয়েছিল সুমিত। পাথরের পেছনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে একহাতে পুজোর প্রসাদের চ্যাঙারি নিয়ে রেণু দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে হাসল। আর সুমিত অবাক হয়ে দেখল হতচ্ছাড়া পাথর ওর বিরাট বপু দুলিয়ে বলছে, 'মায়ি পূজা করলবা।' প্রথম কথা, ওদের হোস্টেলে কোনও মেয়ের ঢোকা বারণ। এ নিয়ে সুপারের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। কোনও গেস্টরুম নেই, আত্মীয়-স্বজন এলে অসুবিধে হয়। শেষ পর্যন্ত সুপার বলেছেন বয়স্কা আত্মীয়া আসতে পারেন—এটা ওদের মেনে নিতে হয়েছে। এই বয়স্কা বিচারের ভার ওই পাথরের ওপর। মাছি গলতে দেয় না। একবার একটি ছেলের মা এসেছিলেন একা দেখা করতে। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলের মায়ের বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি—দেখলে আরও কম মনে হয়। ঢুকতে দেয়নি পাথর। দ্বিতীয়ত সেই পাথরের কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। দিলটা কে। পাথর জানাল সুপার সাহেব নেই, হোস্টেলেও লোক কম। তা ছাড়া এমন ভক্তিময়ী মেয়ে ও দ্যাখেনি। সুমিতবাবুর এই বোন ওকে প্রসাদ দিয়েছে। বাতচিত করে নিন, তবে আধাঘণ্টার বেশি নয়। চলে গেল পাথর।

ঘরে ঢুকেই রেণু বলছিল, 'এই রাগ করেছ?'

এত অবাক হয়ে গিয়েছিল সুমিত, হাঁ করে রেণুকে দেখছিল। লাল পাড় সাদা শাড়ি একটি বাঙালি মেয়েকে এমন রূপসী করে তুলতে পারে আগে জানত না ও। এখন ওর কপালে চিকচিকে ঘাম, রেণু ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। সুমিত ভেবেছিল অনেক কিছু বলবে, অনেক অনুযোগ, অভিমানে ফেটে পড়বে কিন্তু এখন এই রেণুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও বলল, 'বলে গেলে কী হত?'

বাঁ হাতে ওর হাত ধরল রেণু, 'বলে গেলে যেতে পারতাম না যে। তুমি যেতে দিতে বলো?' আসলে যাওয়াটা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। তোমাকে ফোনে জানাব দেখি ফোন খারাপ। তারপর রোজ কী ভীষণ খারাপ লাগত। দুদিনের জন্য গিয়ে সাতদিন থেকে এলাম বাধ্য হয়ে। একা থাকলেই মনটা এমন লাগত সে বুঝতে পারতাম তুমি আমার কথা ভাবছ। আচ্ছা বলত, কাল রাত ঠিক দশটার সময় তুমি কী ভাবছিলে?' ছেলেমানুষের মতো মুখ করল রেণু।

সুমিত মনে করতে চেষ্টা করল, 'রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছিল রেডিয়োতে, শুনতে শুনতে হঠাৎ সেই ডায়মন্ডহারবারের বুড়োটার কথা মনে পড়ল তারপরই তোমাকে—।'

'যাঃ।' চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকাল রেণু, 'এম্মা আমিও এক সময় ভাবছিলাম নৌকায় বেড়ানোর কথা। বাঃ। এই চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি—অনেক দূরে।' রেণুর হাত তখনও ওকে ধরা।

'তুমি আর কখনও আমাকে না বলে কোথাও যাবে না, আমার কষ্ট হয়।' সুমিত কথাটা বলতে বলতে শুনল কারা যেন করিডোর দিয়ে আসছে। চট করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল সুমিত, তারপর কী ভেবে হুড়কোটা তুলে দিল, 'আস্তে কথা বলো, এখানকার ছেলেরা খুব জেলাস।'

'আজ সকালে ফিরেছি। ভাবলাম তোমাকে ফোন করি। তারপরে ঠিক করলাম চমকে দেব তোমাকে। স্নান খাওয়া করে কাউকে না বলে বেরিয়ে এসেছি। আসার সময় মনে পড়ল যে—তোমাদের ধর্মপ্রাণ দারোয়ান আমাকে হয়তো ভিতরে ঢুকতে দেবে না। ঠনঠনের সামনে বাসটা থামতেই একটা প্ল্যান মাথায় এসে গেল। পুজো হচ্ছে না এখন তাই এই প্রসাদ কিনে একজনকে বলে সিঁদুর আর বেলপাতা দিয়ে মায়ের পা ছুঁইয়ে নিয়ে এলাম।'

'কেন?'

'তোমার মঙ্গল হবে তাই!' হাত বাড়িয়ে প্রসাদের চাঙারি সামনে ধরল ও।

'কী আশ্চর্য মেয়ে তুমি।'

'আরও শোনো, এই প্রসাদ দেখিয়ে তোমাদের দারোয়ানকে তো ম্যানেজ করেছি, বলো? ওকে বললাম এ ভীষণ ভারী প্রসাদ, যার উদ্দেশে পুজো তার হাতে না দিলে খুব পাপ হবে। ও বলল, আপনি এখানে দাঁড়ান আমি বাবুকে ডেকে দিচ্ছি। তখন আমি দুটো সিঁদুর লাগা সন্দেশ ওর হাতে দিয়ে কপালে টিপ পরিয়ে দিলাম। ব্যাস লোকটা কেমন ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেল। এই জানো, প্রসাদ নিয়ে না হাতজোড় করে আমায় নমস্কার করল, আমার না যা মজা লাগছিল।' হাসতে হাসতে সুমিতের বুকের কাছে এসে দাঁড়াল রেণু।

'আমি ও প্রসাদ চাই না।' সুমিত বলল। চকিতে মুখ তুলল রেণু। তারপর চাঙারিটা টেবিলের ওপর রেখে হঠাৎ আছড়ে পড়ল সুমিতের বুকে। সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, সুমিত দেখল রেণু পাগলের মতো ওর কাঁধে গলায় মুখ ঘষছে। পায়ের পাতা থেকে হাতের আঙুল অবধি একটা 'কী জানি কী' বিন্দু বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুমিত রেণুর কাঁধে হাত রাখল। দু হাতে সুমিতকে জড়িয়ে ধরেছে ও দাঁড়িয়ে থেকে সুমিত টলতে লাগল। তারপর ও রেণুর মুখ দু হাতে অঞ্জলির মতো করে ওপরে তুলল। রেণুর চোখে জল।

এখন এই নির্জন দুপুরে ওর হোস্টেলের এই ঘরের বন্ধ দরজা সুমিতকে তার সমস্ত ছেলেবেলা, কৈশোর থেকে টেনে এনে ছুঁড়ে দিল যৌবনের রহস্যময় দ্বিধা আর বিস্ময়ে। চোখে চোখ রাখল রেণু। ভিজে চোখের পাতায় এত কথা লেখা থাকতে পারে সুমিত কখনও জানত না। দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল সুমিত। তিল তিল করে বুকের মধ্যে একটা বোধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। এরই নাম কি সুখ। একটা ঘোরের মধ্যে চাপা স্বরে সুমিত বলল, 'রেণু, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

সুমিতের বুকে একটা গাল চেপে রেণু বলল, 'জানি জানি জানি।'

'তুমি?' কাঙালের মতো বলল সুমিত।

'হুঁ হুঁ হুঁ।' একটু একটু করে দুলছিল রেণু। ওর দু হাতের মধ্যে জড়িয়ে থাকা সুমিতের শরীরটায় সেই দুলুনি লাগল। রেণুর মসৃণ মুখ, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ঢেউ—সুমিত মাথা নিচু করল। মুখ নামাল ও—চোখের সামনে একশো নন্দনকানন—রেণু চোখ বুঁজে ফেলল। রেণু কি ভয় পাচ্ছে? ও কি চাইছে না? সুমিত দেখল কী একটা আশ্চর্য মায়ায় রেণুর মুখ ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠছে আরও। রেণুর ঠোঁটে ঠোঁটে রাখছিল ও, রেণুর গরম নিশ্বাস লাগছে মুখে—আর ঠিক সেই সময় এক ঝটকায় মুখ সরিয়ে নিল রেণু। তারপর সুমিতের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলল ও, 'আমি খারাপ, খুব খারাপ।'

খুব নাড়া খেলে কারও সাড়া থাকে না আচমকা, সুমিত প্রথমটা কিছু বলতে পারছিল না, তারপর এগিয়ে এসে রেণুর কাঁধে হাত রাখল, 'এই কী যাতা বলছ?'

'তুমি আমাকে খুব বিশ্বাস করো, না?' রেণু মুখ ফেরাচ্ছিল না।

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি রেণু।'

'অথচ দ্যাখো এই সাতদিন তোমাকে কী কষ্ট দিলাম আমি। তুমি তো একবারও জিজ্ঞাসা করলে না কেন চলে গিয়েছিলাম আমি?'

'তুমি তো বলবেই যদি তেমন কিছু জরুরি হয়।'

দু হাতে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরল রেণু সুমিতকে। তারপর সুমিতের ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল। চমকে উঠল সুমিত—এরকম হচ্ছে কেন? শরীরের সব রক্ত আচমকা টলে উঠল কেন?

চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেবার মতো রেণু ওর কপালে, চোখের পাতায়, গালে, চিবুকে—এখন সারা মুখে ছোট ছোট চুমু খেয়ে যাচ্ছে শুধু নিষিদ্ধ করে রাখছে ঠোঁটটা। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেল সুমিতের, বুকের বাতাস এত ভারী কেন? শেষ পর্যন্ত তিন বছর না খাওয়া কোনও ভিখারির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রেণুর ঠোঁটে। দুটো নরম উষ্ণ অথচ সিক্ত জবাফুলের মতো ঠোঁট পাগলের মতো নিতে চাইল নিজের মতো করে। অস্ফুট আওয়াজ করল রেণু, 'উঃ, একেবারে রাক্ষস, লাগে না বুঝি।' একটু থমকে গেল সুমিত, মুখ তুলে দেখল রেণু হাসছে, 'উম, আমাকে নাও, নাও, নাও।'

একটা ঝড়ো বাতাসের মতো সুমিত রেণুকে বুকে তুলে নিল। ওর অগোছাল বিছানায় রেণুকে শুইয়ে দিল যত্ন করে। ছেলেমানুষের মতো রেণু ওকে দেখছিল। খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সুমিত রেণুর হাতে মুখ রাখল। কী নরম জলের মতো গন্ধ রেণুর হাতে, সমস্ত ছেলেবেলা মনে করিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে মুখ নামাল ও হাতের ওপরের দিকে, বাজুতে। রেণুর বুকের কাছে মুখ রেখে ও কৃপণের মতো চুপ করে বসে থাকল খানিক। আজ অবধি কোনও যুবতী মেয়ের বুক দ্যাখেনি ও—রেণুর বুক কী রকম?

একটা হাত সুমিতের মাথায় রেখেছে রেণু, আঙুলগুলো ওর চুলের ভিতরে খেলা করছে। রেণুর বুকের মধ্যে থেকে মন কেমন করা সুবাস উঠে আসছে ওর নাকে। এই জামা এবং অন্তর্বাসের আড়াল খুললেই রেণুর সমস্ত যৌবনটা ওর সামনে এসে দাঁড়াবে—অথচ ওর খুলতে কেমন ভয় হচ্ছিল। একবার আড়াল ঘুচে গেলেই সব যে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার যা তা কি সাদামাটা নয়? ও আস্তে আস্তে মুখ নামাল নীচে, রেণুর কোমর পেট কী নরম—আঃ।

রেণু চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, এখন ওর ঠোঁটদুটো ঈষৎ খোলা। চিকচিকে কুন্দ ফুলের মতো সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। জিভের ডগা দাঁতের গায়ে সামান্য নড়ছে, 'এই, শোনো।' রেণু ডাকল।

মুখ তুলল সুমিত। রেণুর গলার স্বর কেমন ভারী।

'এখানে এসো। আমার পাশে এসে শোও।' হাত বাড়িয়ে ডাকল রেণু। মুহূর্তে পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে টের পেল সুমিত। এই রেণু একটু আগের রেণু নয়। অনেক ভিতরের থেকে কথা বলছে ও যা সুমিতের বুকের মধ্যে একটা শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে দিল। উঠে এসে রেণুর পাশে শুয়ে পড়ল ও। সরে এল রেণু, তারপর সুমিতের বুকে আঙুলের ডগা দিয়ে আনমনে কী লিখতে লাগল। চোখ বন্ধ করে সুমিত লেখাটা বোঝার চেষ্টা করছিল।

'এই আমাকে বিয়ে করবে? আজ কিংবা কাল।' খুব আস্তে আস্তে রেণু বলল।

'রেণু!' সুমিত অবাক হয়ে গেল।

'আমার ভীষণ ভয় সু, ভীষণ ভয়।'

'কেন, কীসের ভয়, তুমি তো পরীক্ষা দেবে, দেবে না?'

'পরীক্ষা?' হাসল রেণু, 'বাবা ভীষণ ফিউরিয়াস, আর রাস ঢিলে রাখতে চাইছেন না। জামশেদপুর গিয়ে দেখলাম প্রস্তুতিপর্ব পুরোদমে চলছে। ওখানে যাকে দেখলাম সেও শক্ত ধাঁচের মানুষ বলে মনে হল। এখানে আমি রাজি হব না বলে জামশেদপুরে নিয়ে গিয়ে আমাকে দেখানো হল। ভদ্রলোক কী বললেন, জানো, য়ুনিভার্সিটিতে সবারই কিছু না কিছু কাফ লাভ থাকে, আমি কিছু মনে করি না তাতে।'

উঠে বসল সুমিত, 'তুমি বলছ জামশেদপুরে তোমাকে বিয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল!'

মাথা নাড়ল রেণু, 'হুঁ। লোকটা চাকরি করে কলকাতায়, খুব বড় অফিসার। আমার দিকে এমন করে তাকাল যেন আমি খুব বাচ্চা মেয়ে।'

'তুমি কেন দেখা করতে রাজি হলে?' সামনে একটা অন্ধকারের ভারী পরদা, সুমিত দু হাতে তাকে সরিয়ে দিচ্ছিল।

'আমি বুঝতে পারিনি, এমন কী দাদাও আমাকে বলেনি।'

'আমি তোমার বাড়িতে যাব, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব।' সোজাসুজি বলল সুমিত। রেণু হাসল, 'বাবাকে তুমি চেনো না। তুমিই বরং যা করার করে ফেলো। আমি আর পারছি না, যা করবে আমি তাতেই রাজি।'

'কিন্তু আমার তো একটু সময় দরকার।' অন্ধের মতো হাতড়াল ও, 'একটা কাজ না হলে, তুমি তো

সবই জানো—আমি এখনই বিয়ে করতে চাই, কিন্তু বিয়ে করে তোমাকে রাখব কোথায়?'

'আমি জানি না, কিছু জানি না, এসব তুমি ভাববে, আমি আমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দিলাম।' ছেলেমানুষের মতো সুমিতের বুকে মুখ ঘষল রেণু।

'এত ভার দিচ্ছ, আমি তোমার কে?' হাসতে চেষ্টা করল সুমিত। ফিসফিস করে, গভীর নিশ্বাসে রেণু বলল, 'পতি দেবতা গো।'

একমাত্র অশোক, যাকে সব বলা যায়, সুমিত বলল। চুপচাপ শুনে গিয়ে অশোক বলল, 'কুছ পরোয়া নেই, তোর যদি মনে হয় রেণুকে না পেলে তুই মরে যাবি, এক কাজ কর, রেজিস্ট্রি করে ফেল, আমি সাক্ষী দেব।'

'তারপর?' সুমিত প্রশ্ন করল।

'তারপর আর কী! ও পরীক্ষা দেবে, তুইও! আর ওর বাপ শালা যদি নাছোড়বান্দা হয় বিয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে দেবে। আর যা হোক বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না তো।' অশোক সিগারেট ধরাল।

'যদি দেয়।'

'তোদের মাইরি শুধু যদির ধান্দা। এই যে আমি আর ঝুমা কমসে কম' বলে হেসে ফেলল, 'নাইবা শুনলি সংখ্যাটা আমরা একবারও বলিনি যদি কিছু হয়। হলে হবে, দেখা যাবে। আমরা চাঁদা তুলব তোর নামে, রিলিফ ফান্ড।'

বিরক্ত হল সুমিত, 'এইসব, সিরিয়াস ব্যাপারে ঠাট্টা ভাল লাগে না অশোক। তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না—।'

'চা বাগানে কাজ করবি?' হঠাৎ বলে বসল অশোক।

'কী কাজ?'

'কেরানির। কোয়ার্টার পাবি আরও কী কী সব।'

'করব।'

'গুড। প্রেমের জন্য কী স্যাক্রিফাইস। বেশ, চলে যা ঝুমার বাড়ি। ওর মামার দুটো চা বাগান আছে ডুয়ার্সে। ঝুমা ধরলে হয়ে যাবে।'

'সিরিয়াসলি বলছিস!' কল্পনায় সবকিছু দেখতে পেল সুমিত।

'হ্যাঁ ভাই। তোর অবশ্য পরীক্ষা দিলে লাভ হত। তা আর কী হবে। এই আমিই তো পরীক্ষা দেব না।'

'সে কী, কেন?'

'তোকে বলিনি, জুলজিকাল সার্ভেতে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি—হায়দ্রাবাদে পোস্টিং। কেটে পড়ছি। এম. এ. পাশ করে তো আর একটা হাত গজাবে না।'

'বাঃ দারুণ খবর। এতক্ষণ চেপে রেখেছিলি কী বলে।' খুব খুশি হল সুমিত, 'তা বিয়ে করে যাচ্ছিস নাকি।'

'ধ্যুৎ, আমি বলে পালাচ্ছি একঘেঁয়েমির থেকে বাঁচতে।'

'একটা মেয়ের সব জানা হয়ে গেলে কদ্দিন টিঁকে থাকা যায় বল। আর সেটা ঝুমারও মনে হতে পারে। দুজনেই রিলিফ পাব। ছেড়ে দে তুই বরং চলে যা ঝুমার বাড়ি, আমি পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে ফেলি তোর। কী বলিস?'

কোনও কথা বলতে পারেনি সুমিত। কী সহজে অশোক এসব কথা বলে গেল। এতদিনের একটা সম্পর্ক বাঁ হাত নেড়ে অবহেলায় যেন সরিয়ে দিল। ওর মনে পড়ল ডায়মন্ডহারবারের সেই হোটেলটার কথা। প্রয়োজন কত সহজে মিটে যায় কারও কারও। রেণুর ব্যাপারে এ রকমটা ও ভাবতে পারে না, ভাবতে গেলেই রক্ত হিম হয়। কেন?

তখন একটু অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সুমিতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। চোখ বন্ধ করলেই রেণু সামনে এসে দাঁড়ায় আর বুকের মধ্যে একটা ভয় অক্টোপাসের মতো রেণুকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সেই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিল কী অসহায় হয়ে মানুষেরা বেঁচে থাকে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ও ভেবেছে রেণুকে নিয়ে

কোথাও যদি চলে যাওয়া যায়। রেণু ওর থাকবে না, বুকের আড়ালে বসে রেণু চিরকাল থাকবে না—কী অসহ্য কষ্ট ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল ও। ঝুমার কাছে যাবে কি যাবে না ভাবছিল, অশোকই এসে হাজির হল মেসে, 'দিন ফিন ঠিক করে ফেলেছি। আজ হল শুক্রবার, সোমবার দুপুর বারোটায়। এই নে কার্ড। রেণুকে আসতে বলবি ঠিক সময়।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সুমিত, বলছেটা কী? ও শুনেছিল অন্তত একমাসের নোটিস দিতে হয়, আরও কী সব ফর্মালিটি আছে, অথচ অশোক দুম করে দিন ঠিক করে এল।

এক চোখ ছোট করে অশোক হাসল, 'আমার ওপর তোর দেখছি আস্থা ফাস্থা কমে গেছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আমার চেনাশুনা এটা তোকে ভাবতে হবে না। আর হ্যাঁ, তুই তো ঝুমার কাছে যাসনি। কী ব্যাপার ভ্যানিটিতে লাগছে?'

সুমিত বলল, 'ভাবছি।'

হতাশ হবার ভান করল অশোক, 'থাক আর ভাবতে হবে না, ঝুমার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ও অবশ্য একটু আধটু গাঁই-গুঁই করার ধাক্কায় ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। ওর মামার আবার মেয়েদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। ঝুমার কথা ফেলতে পারবে না। দিন দশেক পরেই ভদ্রলোক কলকাতা আসছে। সেন্টপার্সেন্ট সিওর হয়ে থাক।'

সেইদিন দুপুরে বসন্ত কেবিনের বারান্দায় বসে সুমিত রেণুকে বলল, 'সোমবারে তুমি য়ুনিভার্সিটি আসছ?'

ইদানীং কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে রেণু। কথা বলার আগে কী জানি কী ভাবে চোখ তুলে তাকাল, 'কেন?'

'মাঝে মাঝে তো দেখি ডুব মারছ, তাই।' সুমিত কথাটা বলবার জন্য ছটফট করছিল।

একটু হাসবার চেষ্টা করল রেণু, 'আসব।'

'শোন, য়ুনিভার্সিটিতে আসতে হবে না তোমাকে। ঠিক পৌনে বারোটার সময় তুমি ওয়েলিংটনের মোড়ে উষা কোম্পানির দোকানটার সামনে আসবে, আমি থাকব।' সুমিত বলল।

'কী ব্যাপার, আবার কোথায় যাবে।' চা দিয়ে গিয়েছিল বয়, কাপটা টেনে নিতে বলল রেণু।

'আমি চা বাগানে চাকরি নিচ্ছি। শুনেছি ভাল কোয়ার্টার দেয়, নিরিবিলি নির্জন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে ওই সোমবারে ওয়েলিংটনে এসো।' রেণুর চোখে চোখ রাখল সুমিত, 'আমরা ওই সময় বিয়ে করব, রাজি?'

চায়ের কাপটায় চুমুক দেবে বলে তুলেছিল, আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল রেণু।

সুমিত ওর দিকে তাকাল, চোখ বড় হয়ে গিয়েছে রেণুর। আস্তে আস্তে মুখটা খুশিতে ভরে গেল। কোনওরকমে বলল, 'যাঃ।'

সুমিত ঘাড় নাড়ল। অনেকক্ষণ চোখ সরাল না রেণু। তারপর বলল, 'এই, তুমি সত্যি কথা বলছ, বলো।'

'তিন সত্যি কেন তিনশো সত্যি করতে পারি।' সুমিত হাসল, 'সব ঠিকঠাক, শুধু তুমি আসবে এইটুকু বাকি।'

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা সুমিতের আঙুলের ডগাগুলো ছুঁল রেণু, 'চা বাগান অনেক দূরে না—আঃ, তুমি কী ভাল সু, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে সু।'

হঠাৎ সুমিতের মনে হল, আজ ওর বিরাট পাওয়াটা হয়ে গেল। এখন আর কোনও বাধা সামনে নেই আর যেগুলো বাধা বলে সে থোড়াই তোয়াক্কা করে। রেণু সঙ্গে থাকলে সে কলকাতা জয় করে ফেলতে পারে।

'এই একটা কথা বলব?' রেণু অনেকক্ষণ পরে বলল।

'বলো।'

'তুমি পরীক্ষা দেবে না?'

'এ বছর তো হবে না, পরে দেখা যাবে।' প্রসঙ্গটা ভাল লাগছিল না সুমিতের।

'আমার জন্যে. শুধু আমার জন্যে না।'

'রেণু!'

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরে তাকাল রেণু। এখান থেকে মেডিকেল কলেজের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। রেণু বলল, 'চাকরিটা তুমি কী করে পেলে? তুমি তো কোনওদিন চা-গাছ দ্যাখোনি।'

হেসে ফেলল সুমিত, 'আমি তো তোমাকেও চিরকাল দেখিনি, তবু পেলাম কী করে! না, না, শোনো, অশোক ঝুমার মামার মাধ্যমে চাকরিটা জোগাড় করছে।'

'ঝুমার মামার মাধ্যমে?' চোখ তুলল রেণু।

'ভদ্রলোকের অনেক চা বাগান আছে। ঝুমা বললে ফেলতে পারবেন না।' বেশ বিশ্বাসে বলল সুমিত।

'অশোক বলেছে?'

'হ্যাঁ, ও তো সব জানে।'

'তার মানে তুমি এখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাওনি। আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না সু।' ছোট ছোট কয়েকটা আঁচড় রেণুর কপালে ফুটে উঠল।

'কিন্তু অশোক বলছে, ঝুমা কথা দিয়েছে ওকে। আর ওর মামা ঝুমার কথা ফেলতে পারবে না।' মরিয়া হয়ে বোঝাল সুমিত, 'যাদের অনেক চা বাগান আছে তাদের পক্ষে একটা চাকরি দেওয়া কোনও কঠিন কাজ নয়। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

'ভাল। আমার শুধু ভয় হয়। আমার কপালটাই যে এরকম সুখ একদম সতিন হয়ে আছে। ওর কথা বলার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল সুমিত কিছুতেই সেটাকে মেনে নিতে পারছিল না। অথচ রেণু যখন এই ধরনের কথা বলে ওকে বাধা দিয়ে কোনও লাভ হয় না। এই সময়ের রেণুকে কিছুতেই চিনতে পারে না সুমিত, এই ধরনের কথাবার্তা শুনলেই কেমন ভয় হয় ওর।

'ঝুমার কাছে তুমি গিয়েছিলে?' রেণু আবার বলল।

'না। অশোকই যোগাযোগ করছে।'

'ঝুমা আর অশোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে জানো?'

এই প্রশ্নটাকেই ভয় করছিল সুমিত। এতদিন মেলামেশার পর কত সহজে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারে না সুমিত। আর রেণুকে ও এর কী উত্তর দেবে। ভালবাসা যদি পরস্পরকে কাছে আনার জন্য সৃষ্টি হয় তা হলে এইভাবে বিচ্ছেদ কেন শুরুতেই। এই ঘটনা কি রেণুকে প্রভাবিত করবে অন্য কোনও চিন্তায় যেতে? ও অবশ্য জোর করে বলবে সবাই অশোক বা ঝুমা নয়। কিংবা কোনও ভুল ওরা আবিষ্কার করে সচেতন হয়েছে। কিন্তু রেণু আবার বলল, 'ঝুমা এখন একটি অবাঙালি ছেলের সঙ্গে মোটরে ঘোরে, সবাই বলছে, তুমি জানো?'

এটা জানত না সুমিত। তবে অশোক ছাড়াও ঝুমার অনেক ছেলে বন্ধু আছে এ খবর তো খুব পুরনো। বাস্তবিক, প্রথম প্রথম ও অবাক হত, ভাবত অশোক এটাকে কী করে সহ্য করছে। কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে ক্রমশ মনে হয়েছিল, এটা আসলে কোনও ব্যাপারই নয়। ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিল মানুষ ভালবাসলেই নিশ্চয়ই আনসোস্যাল হয়ে পড়বে না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে যদি নিজস্ব বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা যায় তাতে হানিকর কিছু ঘটে না। ভালবাসার মূলমন্ত্র যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তবে যে কোনও ব্যাপারেই মানিয়ে নেওয়া চলে। মনে হয়েছিল অশোকের তুলনায় ঝুমার প্রকাশ একটু উগ্র। তা আর কী করা যাবে, হাতের পাঁচটা আঙুল তো আর সমান হয় না। ঝুমার ক্ষেত্রে তা সমান করতে গেলে বরং অসুবিধেই হত। একটা মানুষের পাঁচটা আঙুল সমান—ভাবা যায়! সে একটা শব্দ স্বচ্ছন্দে লিখতেও পারবে না।

কিন্তু এসব কথা রেণুকে বলল না সুমিত। ঝুমা আর অশোক ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন যে ঝুমা কোনও অবাঙালি ছেলের সঙ্গে মোটর করে ঘুরছে এটা কি অশোককে অসম্মান করা নয়? ছাড়াছাড়ি মানে কয়েকটা সম্পর্কের কাটান-ছাড়ান? অশোক তো এমনিতে ঝুমার সঙ্গে কথা বলে, নইলে সুমিতের পক্ষে সুপারিশ করছে কী করে? সেদিক দিয়ে অশোক কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না বোঝা যায়। আর ঝুমার এই নতুন মেলামেশা কি মোটা দাগ দিয়ে আন্ডার লাইন করে দিচ্ছে অশোকের সঙ্গে মেলামেশাটা আন্তরিক ছিল না? নাকি ঝুমা আর একবার চাইছে হৃদয়টা বাঁচিয়ে রাখতে, নিজের জন্য।

অসম্মান-টসম্মান সব বাজে ব্যাপার।

সুমিত খুব ক্লান্ত চোখে তাকাল রেণুর দিকে, 'ছেড়ে দাও ওদের কথা। সব কিছু তো আমি বুঝতে পারি না।'

সোজাসুজি রেণু বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না, বলো?'

'পাগল!' সঙ্গে সঙ্গে বলল সুমিত।

'আচ্ছা তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস?' অনেক দূর থেকে বলল রেণু।

'কী প্রমাণ চাও?'

'আমি যদি কোনও অন্যায় কাজ করে এসে বলি, ক্ষমা করো, করবে।'

'আমি সেটাকে অন্যায় বলে ভাববই না।'

'আমি যদি বলি পাঁচ বছর আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি তোমার কাছে আসব, আসব, আসব। তুমি অপেক্ষা করবে?'

'হ্যাঁ আমি করব। কিন্তু এসব কথা উঠছে কেন? তুমি সোমবার দুপুরে ওখানে আসবেই। আমি আর কোনও রিস্ক নিতে চাই না রেণু।'

'আমি আসব।'

রেস্টুরেন্ট থেকে নামবার সময় রেণু হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, 'এই তোমার হাতটা ধরতে খুব ইচ্ছে করছে গো।'

'থমকে দাঁড়াল সুমিত। এখন চারিদিকে বেশ ভিড়। লোকজন উঠছে, নামছে। কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন রেণুকে হাতটা ধরতে দিলে কেমন দেখাবে! ধর্মতলা পাড়ায় ফিরিঙ্গি মেয়েরা কী সহজে বন্ধুদের হাত ধরে যায়। অথচ এখানে রেণুর হাত ধরতে ওর সংকোচ হচ্ছে কেন? হঠাৎ ও হাত বাড়িয়ে রেণুর নরম হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে সোজা পায়ে চলে এল বাইরে। একরাশ লোক সিনেমা দেখার মতো বিস্ময়ে তাকিয়েছিল ওদের দিকে। বাইরে বেরিয়ে এসে আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে রেণু বলল, 'এই তুমি কী করলে গো?'

সুমিত বলল, 'আমি সব পারি, সব।'

ঠিক আধ ঘণ্টা আগে ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে দাঁড়াল সুমিত। এখন বেশ রোদ উঠে গেছে। অফিস যাবার তাগিদে এসপ্ল্যানেড যাবার গাড়িগুলোয় প্রচণ্ড ভিড় এখন। মোড়েই বাসস্টপ। বালিগঞ্জের দিক থেকে আসা বাসগুলো কিন্তু ফাঁকা। এর যে কোনও একটা বাসে রেণু এসে পড়বে। সুমিত দেখল ঘড়িতে এখন এগারোটা বেজে কুড়ি।

কাল সারারাত প্রায় বিনিদ্র কেটেছে ওর। অদ্ভুত একটা আনন্দ মেশানো ভয়, অনিশ্চয়তায় ও ছটফট করেছে। অনেক দূরে বিহারের এক শহরে থাকা মায়ের কথা মনে হয়েছে বার বার। মা শুনলে কী বলবেন? একবার ভেবেছে মাকে সব বুঝিয়ে চিঠি লেখে। কিন্তু সাহস হয়নি ওর। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, সব চুকে যাক তখন জানানো যাবে। হয়তো মা মেনে নেবেন না। কোনও মা-ই নিজের সন্তানকে উপায় না থাকলে পছন্দ করে বিয়ে করতে দিতে চান না। আর ওর এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না শুনলে তো কোনও কথাই নেই। একটা বয়স ছিল যখন মায়ের মনে কষ্ট দেবার কথা ভাবনায় আসত না। তেমন কিছু হলে নিজেকে কী অপরাধী মনে হত। এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে দূরত্বটা কত দূর বেড়ে গেছে। যৌবনে এসে গেলে প্রত্যেকের নিজের নিজের আয়না তৈরি হয়ে যায়। নিজের মুখ নিজের মতো করে দেখা যায় তাতে, মায়ের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হয় না আর। মায়েদের দুঃখ বোধহয় এইখানেই।

মিনিট দশেক আগে অশোক এসে গেল। আর সুমিত অবাক হয়ে দেখল, সঙ্গে ঝুমা। দারুণ সেজেছে মেয়েটা, এই সকালে মাথায় একটা গ্ল্যাডিয়োলাসের কুঁড়ি গুঁজেছে। অশোকের সঙ্গে ঝুমাকে ভাবতেই পারেনি সুমিত। ট্যাক্সি থেকে নেমে ঝুমা বলল, 'কী দেখছেন অমন করে, আজ তো অন্যলোককে দেখতে হবে, চোখ তার জন্য বন্ধ রাখুন।'

'আমি ভাবতে পারিনি—' সুমিত বলতে গিয়ে থেমে গেল।

'ইচ্ছে করেই চলে এলাম। বিয়ে দেখতে কোন মেয়ের খারাপ লাগে বলুন। আর সাক্ষী হিসেবে সই দিতে আমার খুব সাধ। আর তার ওপরে আপনার বিয়ে বলে কথা।' বেশ জোরে জোরে বলছিল ঝুমা। সুমিত দেখল আশেপাশের দাঁড়ানো লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখছে। কেমন লজ্জা লাগল, 'তোরা এগো, আমি অফিসটা দেখে এসেছি, রেণু এলেই নিয়ে যাব।'

'আপনার বিয়েতে কী প্রেজেন্টেশন দেব জানেন?' ঝুমা হাসল।

অশোক বলল, 'তোর চাকরি কনফার্মড। ঝুমা প্রমাণ নিয়ে এসেছে।'

সুমিত মাথা নিচু করল, 'কী বলে আপনাকে—।'

অশোক বলল, 'গুড, গুড, বেশ ফর্মালিটি চলছে। আচ্ছা, আমরা এগোচ্ছি তুই আয়। বারোটা পাঁচ নাকি খুব শুভ সময়। পাঁজিতে আছে। রেণুর চলে আসা উচিত ছিল এতক্ষণে।' ওরা এগিয়ে গেল রাস্তা পার হয়ে সামনের বড় বাড়িটার দিকে।

বুকের মধ্যে একটা আনন্দ টগবগিয়ে উঠেছে। যাক, চাকরিটা তা হলে পাওয়া গেছে, মুখে না বলুক, একটু দ্বিধা ছিল সুমিতের, যদি শেষ পর্যন্ত না হয়। এখন ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু রেণু এখনও আসছে না কেন? একটা টু-বি বাসকে দুলতে দুলতে আসতে দেখল ও। কিছু লোক নামছে। না রেণু নেই। বাসটাতো ফাঁকা। রেণু ইচ্ছে করলেই চলে আসতে পারত। এর পরের বাসটা কতক্ষণে আসবে? ঘড়ি দেখল সুমিত। ঠিক পৌনে বারোটা বাজে এখন। এত দেরি করছে কেন? ও কি খুব সাজগোজ করছে? আর একটা ডবলডেকার আসছে, না, এটা তিন নম্বর। বালিগঞ্জের বাস নয়। রেণু তো ট্যাক্সি করেও আসতে পারত। আজকের দিনে একটু বেহিসাবি হলে ক্ষতি কী!

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। পায়ের তলা ঘামছে সুমিতের। বারোটা পাঁচ মিনিট শুভ সময়—রেণুর যদি একটু আক্কেল হত। এ খবরটা আগে ওকে জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করত রেণু। সময়-টময় বেশ মানে ও। শিবরাত্রির সময় উপোস পর্যন্ত করে। কিন্তু এখনও আসছে না কেন? ওর বাড়িতে ফোন নেই, থাকলে করা যেত। অবশ্য পাশের বাড়িতে আছে নম্বরটা দিতে চায়নি রেণু। যার ফোন তিনি পছন্দ করবেন না। কী যেন নাম—সুমিত মনে করতে চেষ্টা করল, রায়চৌধুরী—হ্যাঁ হ্যাঁ ওই টাইটেলই তো। একদিন রাত হচ্ছিল বাড়ি ফিরতে। রেণু ফোন করতে গিয়েছিল এক দোকান থেকে বাড়িতে খবর দেবার জন্য। ফোনটা ভাল ছিল না। জোরে কথা বলতে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নম্বর বুঝতে পারছিলেন না, রেণু নাম জিজ্ঞাসা করছিল। তখন রায়চৌধুরী টাইটেলটা শুনতে পেয়েছিল ও। রায়চৌধুরী, যেহেতু রেণুদের পাশের বাড়ি, নিশ্চয় বালিগঞ্জ স্টেশন রোড। একবার গাইড দেখে ফোন করবে নাকি! হাতের তালু ঘামছে এবার। সুমিত দেখল একটা দু নম্বর বাস আসছে। ভিড় আছে বাসটায়। হলুদ শাড়ির আভাস দেখে সুমিত হাসবার চেষ্টা করল না, ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। আড়চোখে সুমিতকে দেখে ব্যাগ থেকে গগলস্ বের করে চোখে এঁটে চলে গেলেন ওয়েলেসলির দিকে। না রেণু এই বাসটাতেও এল না। এখন বুকের মধ্যে একটা শীতল ভয় চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে, সুমিত অসহায়ের মতো তাকাল। এখন রাস্তা ফাঁকা। কোথাও বাস-ট্রামের চিহ্ন নেই। যেন শেষ বাস চলে গেল এইমাত্র, সুমিত হতাশ চোখে সামনের বাড়িটার দিকে তাকাল। অশোকরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছে। ওদের কি খুব তাড়া দিচ্ছে রেজিস্ট্রার? বারোটা পাঁচ চলে গেলে আর কি শুভক্ষণ পাওয়া যাবে না? শুভক্ষণ-ফণ আবার কী—যখনই ইচ্ছে হবে তখনই সময় শুভ। একটু সরে দাঁড়াল সুমিত। রেণু, রেণু, রেণু। মনে মনে ডাকল ও। ডাকার মতো ডাকলে সব পাওয়া যায়। তবু রেণু আসছে না কেন? তবে কি রেণু আসবে না! ওর মনে পড়ল সেদিন কথা বলার সময় রেণু কেমন অন্যমনস্ক ছিল। রেণু ওকে অপেক্ষা করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল। কেন?

খুব দ্রুত কেউ ঢাক বাজাচ্ছে বুকের মধ্যে বসে—সুমিত মাথা নাড়ল। তারপর সামনের দোকানে ঢুকে পড়ল ও। এখান থেকে বাসস্টপ পরিষ্কার দেখা যায়। রেণু যদি আসে ও চট করে বেরিয়ে আসতে পারবে। কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকের কাছে ফোন করতে চাইল ও। মাথা নাড়তে গিয়ে কী ভেবে আঙুল দিয়ে ফোনটা দেখিয়ে দিলেন উনি, 'আনা লাগবে।'

চট করে গাইডটা খুলে ও রায়চৌধুরী বের করল। আঃ, কলকাতায় কত রায়চৌধুরী আছে! এই তো রায়চৌধুরী—ও ঠিকানাটা দেখছিল। রায়চৌধুরী—স্টেশন রোড বালিগঞ্জ—এটাই হবেই নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ওর নজরে পড়ল ওই একই রাস্তায় আর তিনজন রায়চৌধুরীর টেলিফোন আছে। কোনজন হবে? রেণুদের বাড়ির পাশেই যখন, ওর হঠাৎ মনে পড়ল, আর মনে পড়ল শরীর হিম হয়ে গেল, রেণুকে কোনওদিন বাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করেনি সুমিত। রেণুও কোনওদিন বলেনি তাকে। শুধু জানে সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামে একটা বিরাট মিষ্টির দোকানের সামনের বাড়ি ওটা।'

এখন কী হবে। হঠাৎ প্রথম নম্বরটা ডায়েল করল ও, চারটের একটা তো নিশ্চয়ই হবে। রিং হচ্ছে ওদিকে। একজন ফোন ধরল, বেশ হেঁড়ে গলা। সুমিত নম্বরটা যাচাই করতে ওপাশ থেকে বলল, 'হ্যাঁ, কাকে চাই?'

গলাটা নরম করে সুমিত বলল, 'দেখুন খুব জরুরি দরকার, আপনার পাশের বাড়ি থেকে রেণুকে ডেকে দেবেন?' সঙ্গে সঙ্গে একটা ধমকানি শুনল ও, 'ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না, না?' কট করে কেটে গেল লাইনটা। মাথা নেড়ে ফোনটায় ডায়েলিং টোন আবার ফিরিয়ে আনল সুমিত। দ্বিতীয় নম্বরটায় ডায়েল করতে অনেকক্ষণ রিং হল। তারপর একটি মহিলাকণ্ঠ বলে উঠল, 'হে-লো-ও।' খুব বিনীত গলায় সুমিত বলল, 'দেখুন আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি আপনার পাশের বাড়ির রেণুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কোন রেণু?' কণ্ঠস্বরে লবঙ্গলতিকা ভার।

আর কোনও রেণু আছে নাকি, একটু ঘাবড়ে গেল সুমিত, 'রেণু—মানে রেণু রায়, য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে।'

মৃদু হাসির শব্দ, 'আপনিও কি য়ুনিভার্সিটিতে পড়েন?'

'হ্যাঁ, ওকে আমার দরকার।' তাড়াতাড়ি করছিল সুমিত।

'আমাকেই বলুন না, আমি দেখতে খুব খারাপ নই, খিলখিলিয়ে হেসে উঠল কণ্ঠ, 'ঢং সত্যি বলতো তুমি কে? তোমার গলা আমি চিনি না, না? শোনো, এখনই চলে আসতে পারবে? বাড়িতে কেউ নেই, আমি একা, গ্রেট চান্স।'

ফোনটা নামিয়ে রাখল সুমিত। বাপ্‌স। এখন আছে আর দুটো নম্বর বাকি। এমন সময় কাউন্টারের ভদ্রলোক বলল, 'একটা টাকা দিন।'

সুমিত বলতে চাইল, 'আমার এখনও—।'

বাধা দিলেন ভদ্রলোক, 'বুঝতে পেরেছি। আমার এখান থেকে এসব ফোন আমি পছন্দ করি না। ফোনে মেয়েদের ডিস্টার্ব করছেন আবার—দিন দিন—'

ভদ্রলোকের বাড়ানো হাতে টাকাটা ধরিয়ে বেরিয়ে এল সুমিত। এখন ওর সর্বাঙ্গে ঘাম জমে গেছে, ধর্মতলা স্ট্রিটের কড়া রোদ কেমন বিবর্ণ লাগছে। ও দেখল অশোক বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কাছাকাছি হতেই অশোক বলল, 'কী হল?'

'বুঝতে পারছি না।' অশোকের দিকে তাকাল না সুমিত।

ঘড়ি দেখল অশোক, 'প্রায় সাড়ে বারো বাজে। আসবে বলে মনে হয় না আর। এই মেয়েছেলে জাতটা এমনই।'

খুব দুর্বল গলায় বলল সুমিত, 'হয়তো অসুখবিসুখ করেছে, কিংবা বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না—'

'আমি বিশ্বাস করি না।' অশোক বলল, 'আজ অবধি কোনও মেয়েব বিয়ের দিন অসুখ করছে বলে শুনেছিস? মেয়েটা যে চাপা গম্ভীর প্রকৃতির বাড়িতে নিশ্চয়ই টের পাবে না। ও মুখে বলে এক, ভাবে আর এক।'

আর একটা দক্ষিণের বাস চলে গেল। রেণু এল না। অশোক বলল, 'এখন কী করবি?'

'বুঝতে পারছি না।' খুব ক্লান্ত গলায় বলল সুমিত। ও দেখল ঝুমা সামনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে। খুব লজ্জা করছে সুমিতের, ঝুমার সামনে ও মুখ দেখাবে কী করে।

ঝুমাকে দেখে অশোক বলল, 'শোনো, মনে হচ্ছে কোনও গোলমাল হয়েছে, বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে রেণু, আমরা দেখতে যাচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ঝুমা, 'খুব খারাপ লাগছে সুমিত, সার, আজকের দিনটা এভাবে নষ্ট হল, যান আপনারা, আশা করি মারাত্মক কিছু হয়নি ওর।' ঝুমার দিকে তাকাল সুমিত, মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারছে না ও।

ঝুমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে অশোক বলল, 'চল।'

সুমিত ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'কেন?'

'বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। রেণু চাইবে না আমরা যাই।'

'ছাড় তো, তোর এখন অবশ্যই যাওয়া উচিত। এত দূর এগিয়ে এসে কোনও মেয়ের রাইট নেই এভাবে কেটে পড়ার। তোরও যদি ইচ্ছে না থাকত তা হলে অন্য কথা হত। তুই চল, ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেল আজই।' খুব দৃঢ় গলায় বলল অশোক।

ভয় এবং দুঃখ থেকে মানুষের মনে এক ধরনের শক্তির জন্ম নেয়, যা তাকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার রসদ জোগায়। অদ্ভুত এক হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুমিত সেইরকম একটা অবলম্বন খুঁজছিল। এখন ও একবার রেণুকে যদি দেখতে পেত, রেণু নিশ্চয়ই বলবে কী হয়েছে আর তা হলেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। তবু সুমিত বলল, 'ওর বাড়ির লোক খুব গোঁড়া।'

উলটোদিকের বাস স্টপে এগিয়ে যেতে যেতে অশোক বলল, 'সেটা আমার উপর ছেড়ে দে।'

বালিগঞ্জ স্টেশন রোড ধরে এগোতে এগোতে অশোক বলত, 'বাড়ির নম্বরটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিসনি, কী প্রেম করছিস বাবা! বাবার নাম কী?'

সুমিতের খুব সংকোচ হচ্ছিল ব্যাপারটা, নিজের কাছেই কেমন হাস্যকর মনে হচ্ছে। সত্যি তো এত দিন এসব চিন্তাও করেনি। রেণুর বাবা কিংবা দাদার নাম অথবা তাঁরা কী করেন—এইসব ব্যবহারিক প্রশ্ন কোনওদিন মাথায় আসেনি। রেণু যখন আসত তখন অন্যকোনও কথা মনে করার কোনও উপায়ই ছিল না। কিন্তু এখন অশোকের প্রশ্ন শুনে মনে হল এই যে এর উত্তর দিতে পারছে না খুব স্বাভাবিক ভাবেই অশোক ওদের সম্পর্কের গভীরতা সম্বন্ধে আস্থা হারাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সুমিত বলল, 'ওসব ডিটেলস আমি কোনওদিন জিজ্ঞাসা করিনি ওকে। তার চেয়ে চল, ফিরে যাই, আমার ভাল লাগছে না।'

ঠিক সেই সময় অশোকের নাম ধরে একটা গলা চেঁচিয়ে ডাকল। ওরা দেখল মোড়েই একটা চায়ের দোকানে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তাদের একজন হাত তুলে অশোককে ডাকছে। সুমিত বলল, 'চিনিস নাকি এ-পাড়ার কাউকে?' অশোক কিছু বলার আগে ছেলেটি বেরিয়ে এল। রোগা, ফরসা, ছিপছিপে গড়ন, চোখে চশমা আছে, অশোককে দেখে হইহই করে জড়িয়ে ধরল, 'আরে ব্বাস গুরু, তুমি এ-পাড়ায়, আমি শালা প্রথমটায় চিনতেই পারছিলাম না।'

'বিপ্লব না?' অশোক বিস্ময় কাটিয়ে উঠল, 'কী আশ্চর্য, তুমি এখানে।'

'বাঃ, এটাতো আমার পাড়া। বছর পাঁচেক হল এখানে চলে এসেছি আমরা। এসো এসো চা খাবে।' প্রায় জোর করে ওদের রেস্টুরেন্টে ধরে নিয়ে গেল বিপ্লব। সুমিত দেখল এই ভরদুপুরেও কয়েকটি ওদের বয়সি ছেলে আড্ডা মারছে দুটো টেবিল জুড়ে। ছেলেগুলোকে দেখলে বোঝাই যায় বেকার, দু-একজনের গালে মাথায় কাটা দাগ আছে। কথাবার্তাও সুবিধের নয়। সুমিতদের আড়চোখে দেখল ওরা। এদের সঙ্গেই বিপ্লব আড্ডা দিচ্ছিল।

অশোক পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। বিপ্লব অশোকের সঙ্গে একসময়ে মেট্রোপলিটনে পড়ত। খুব ডানপিটে ছেলে। বিপ্লব বলল ও এখন রাত্রে এম. কম. পড়ছে। দিনের বেলা চাকরির ধান্দায় আছে।

চা দিতে বলে বিপ্লব জিজ্ঞাসা করল, 'এই দুপুরে এ পাড়ায় কোথায় যাচ্ছ গুরু।' কথাটা শুনে অশোক আড়চোখে সুমিতের দিকে তাকাল। তারপর যেন মহা ঝামেলায় পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আরে আর বলো না, য়ুনিভার্সিটির ইলেকশন আসছে, তোমাদের এ পাড়ার একটি মেয়ে নমিনেশান পেপার সাবমিট করে আর যাচ্ছে না। খোঁজ নিতে এসেছি কী ব্যাপার।'

'আমাদের পাড়ার মেয়ে ইলেকশনে লড়ছে।' অবাক গলায় চেঁচিয়ে উঠল বিপ্লব, 'কে ভাই?'

বিপ্লবের গলা শুনে ওপাশের আড্ডাটা চুপ মেরে গেল আচমকা। সুমিত দেখল ওরা এদিকে তাকিয়ে আছে। অশোক আবার এ কী গল্প ফেঁদে বসল, সুমিত অস্বস্তিতে বাইরের দিকে তাকাল।

'চিনবে তুমি?' অশোক বলল।

'বাঃ চিনব না কেন? এ পাড়া থেকে মোট পাঁচটা মেয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট হিসেবে ভাবা যায় না কাউকে।' বিপ্লব চায়ের কাপ এগিয়ে দিল।

'রেণু, রেণু রায়।' অশোক চায়ে চুমুক দিল।

সুমিত দেখল বিপ্লবের মুখ কেটে যাওয়া দুধের মতো হয়ে গেল। ফিসফিস করে ও বলল, 'রেণু? কী বলছ কী?'

অশোক বলল, 'চেনো?'

বিপ্লব ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুদের দেখল, ওরাও শুনতে পেয়েছে। এখন কেউ কোনও কথা বলছে না। সবাই কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। বিপ্লব বলল, 'হাড়ে হাড়ে।'

'কেন, মেয়ে কেমন? ডোবাবে না তো?' অশোক খুব ভাল অভিনয় করতে পারে, মনে মনে সুমিত বলল। ও এমনভাবে চা খেতে খেতে কথাটা বলল যেন কিছুই হয়নি। বিপ্লবের হাড়ে হাড়ে চেনা ব্যাপারটা সুমিতের খারাপ লাগছিল। ও দেখল ওর সামনে রাখা চায়ের কাপে সর পড়ছে একটু একটু করে।

হাসতে হাসতে বিপ্লব বলল, 'কোথায় খাপ খুলেছ শিবাজি, এ যে পলাশি। এ জিনিস কোনও ফ্রেমে বাঁধানো যাবে না মাইরি। আমরা সব কটা ওর হাফসোল খাওয়া মাল। অল সেকেন্ড হ্যান্ড।'

অশোকও হাসল, 'ব্যাপারটা কী?'

'দারুণ কেসিয়াস মেয়ে ভাই। কতগুলো কেস আছে ভগবান জানে। ওই যে দেখছ কালো গেঞ্জি ওর নাম সুখেন। তিন বছর ওকে গড়িয়াহাটা মোড় থেকে এই রাস্তা অবধি হাঁটিয়ে এনেছে। স্রেফ কিছু না, ও কলেজ থেকে আসত, নামত গড়িয়াহাটে। সুখেনবাবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ওর জন্যে। তারপর তিনি হেসে হেসে গল্প করে করে এই অবধি এসে কাটিয়ে দিতেন ওকে। সুখেন চেষ্টা করেছে রেস্টুরেন্টে ঢোকাতে, পারেনি। ভিক্টোরিয়া, লেক, সিনেমা—কোনও চান্স পায়নি সুখেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সুমিত শুনল কালো গেঞ্জি পরা ছেলেটি চাপা গলায় কী বলে উঠতেই আর সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

হঠাৎ বিপ্লব বলল, 'শুনলাম য়ুনিভার্সিটিতেও নাকি কাউকে খুব ড্রিবল করাচ্ছে। বেচারার প্রেমের কবরে আমাদের ফুল দেওয়া থাকল।' আবার হো হো হাসি উঠল রেস্টুরেন্টে। সুমিতের মনে হল ও যদি উঠে সটান বিপ্লবের নাকে একটা ঘুষি মেরে দিতে পারত, সুমিত দেখল অশোকের চটিপরা পা ওর পায়ের ওপর আলতো করে চাপ দিল।

অশোক বলল, 'এসব বাবা তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ, আমাদের চিন্তা ইলেকশন নিয়ে। মেয়েটা কোন বাড়িতে থাকে?'

ওপাশের বেঞ্চিতে একটা ছেলে ফস করে বলল, 'ওই যে সামনে মিষ্টির দোকান দেখছেন তার উলটোদিকে, হলুদ বাড়ি।'

অশোক বিপ্লবকে বলল, 'তুমি চলো আমাদের সঙ্গে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত পা নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠল বিপ্লব, 'ভাই আমার লাইফ ইন্সুরেন্স নেই, ওই বুড়োর একটা রদ্দা খেলে আমি মরে যাব। আর ওর মায়ের মুখের যা জোর ওই রদ্দারও বাবা। একমাত্র ওর দাদাই যা কিছু ভদ্রলোক। তাকে আমরা তো পাড়ায় দেখিই না বলতে গেলে। তুমি ওখানে ইন করো, আমি বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়িটা একতলা, সামনে রেলিং দেওয়া রোয়াক। জানালাগুলো বন্ধ। বিপ্লব ওদের দেখিয়ে দিয়ে চলে যেতে অশোক বলল, 'ওর বাবার সঙ্গে যা বলার আমি বলব। তুই চুপ করে থাকবি।' সত্যি বলতে কী সুমিতের এখন কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। রেণু সম্পর্কে এই ছেলেগুলো যা বলল তা হিংসে থেকে বলা যেতে পারে। তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল না সুমিত। কিন্তু এখন সবার সামনে রেণুর কাছে জবাবদিহি চাইতে ওর মন সায় দিচ্ছিল না। এ ব্যাপারটা ও আলাদা করে নিজেই করতে পারত। ওর মন বলছে আজকে রেণুর না যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনও গোপন গুরুতর কারণ আছে। হয়তো রেণু সে কথা সবার সামনে উচ্চারণ করতে পারবে না।

কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল অশোক। এখন প্রায় দুটো বাজে। চারধারে রোদ খাঁ খাঁ করছে। সুমিত দেখল সামনের মিষ্টির দোকানে বসে দুটো ছেলে কৌতূহলী চোখে ওদের দেখছে। একটা ঝি মতো মেয়ে ঘোমটা টেনে দরজা খুলে দিয়েই ভিতর চলে গেল তাড়াতাড়ি। সুমিত শুনল বেশ হেঁড়ে গলায় একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওখানে?'

ওরা ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। সামনের দেওয়াল ঘেঁসে সোফা সেট। বাঁদিকে একটা ডিভান পাতা। সামনের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি তার নীচে লেখা, হে ভারত ভুলিও না—। সোফায় বসে আছেন যিনি তিনিই প্রশ্নটা করেছেন। গোলগাল চেহারা তবে বোঝাই যায় ব্যায়াম-ট্যায়াম করতেন এককালে। পঞ্চাশের ওপারে বয়স যদিও, তবু বাইসেফগুলো দেখা যায় বেশ। লুঙ্গি পরা, খালি গা। মাথায় ছোট করে চুল ছাঁটা। মনে হয়, মাথাটা কে যেন ঘাড়ের ওপর আচমকা বসিয়ে দিয়েছে। মুখটা গোল। ওদের দেখে চোখ ছোট হয়ে গেল ভদ্রলোকের, বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন আবার, 'কী চাই?'

সুমিত উশখুশ করল। অশোক বলল, 'এটা, মানে এখানে কি রেণু রায় থাকেন?'

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?' গলায় স্বর রুক্ষ হয়ে গেল হঠাৎ।

'য়ুনিভার্সিটি থেকে। ওকে একটু ডেকে দেবেন?' অশোক নির্বিকার গলায় বলল। পা ছড়িয়ে বসেছিল ভদ্রলোক, চকিতে চটি জোড়া টেনে নিয়ে সোজা হলেন, 'কী দরকার?'

'দরকার আছে নিশ্চয়ই, নইলে এই দুপুরে আসতাম না। অশোক হাসল, 'ওকে ডেকে দিন।'

'যা দরকার আমাকে বলো। আমি ওর ফাদার।' গর্জন করে উঠলেন ভদ্রলোক। সুমিত দেখল ওর গলার নালি কাঁপছে। সুমিত কিছু বলতে যাচ্ছিল অশোক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল, 'সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না, তা ছাড়া আপনি আমাদের সমবয়সি নন। বরং রেণুকেই ডেকে দিন।'

'গেট আউট, আই সে গেট আউট।' গম গম করে উঠল ঘর।

'তা কী হয়! এত দূর থেকে এই রোদ্দুরে আমরা তো মিছিমিছি আসিনি। ওর যাবার কথা ছিল—।'

'আই সি, তা হলে তুমিই সেই ডিবচ। রেজেস্ট্রি করবে রেণুকে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে পুলিশে দেব, দীপক দীপক—।' চেঁচাতে লাগলেন ভদ্রলোক। ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গলা, বোধহয় পরদার পাশেই ছিলেন মহিলা, ভেসে এল, 'দূর করে দাও না, চাল নেই চুলো নেই—সাহস দেখে মরে যাই, বাড়ি বয়ে এসেছে দ্যাখো। দীপু বাড়ি নেই।' গলাটা শুনে সুমিত অনুমান করল বিপ্লবের কথামত এই তা হলে রেণুর মা। অশোক বলল, 'আপনি ভুল করছেন, রেণুর সঙ্গে বন্ধুত্ব এর, আমার বন্ধু। ঠিক আছে আপনি যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইছেন না, তা হলে আপনাকেই সব বলি, শুনুন। কিন্তু বসতে বলবেন তো?' ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। তিরের মতো পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল রেণু। তারপর ছুটে এসে সুমিতের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এল। চমকে গিয়েছিল সুমিত। অবাক হয়ে দেখল রেণুর চোখে জল, কাঁদলে রেণুকে এরকম সুন্দর দেখায় যে, বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে যায়।

লোহার রেলিংঘেরা রকে দাঁড়িয়ে রেণু বলল, 'আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, আমি খারাপ, খুব খারাপ, তবু তুমি কেন এলে, কেন?' রেণু কাঁদছিল।

সুমিত বলল, 'রেণু, তুমি কেন এলে না, রেণু?'

''লোকে তো কত কিছু ত্যাগ করে, আমাকেও না হয় তুমি ত্যাগ করলে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।' ফোঁপাতে লাগল রেণু। সুমিত শুনল ভিতর থেকে রেণুর বাবা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে ওকে ডাকছেন। অশোক দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। সুমিত দেখল সামনের মিষ্টির দোকানের ছেলে দুটো বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁ করে ওদের দেখছে। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে, তাঁদেরও নজর এদিকে।

সুমিত চাপা গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো রেণু, আমি তোমাকে কী করে বোঝাব—।'

ওর হাত রেণুর মুঠোয় তখনও ধরা। রেণু কাঁপছিল। 'তুমি যাও, পায়ে পড়ি তোমার, যদি তুমি ভালবাস আমাকে, তা হলে এখন চলে যাও। আমি তোমাকে সব জানাব, কথা দিচ্ছি, তিনটে দিন আমাকে সময় দাও, প্লিজ।'

রেণুর বলার মধ্যে এমন একটা স্বর ছিল সুমিত সরে দাঁড়াল। মিষ্টির দোকানের সামনে জটলাটা বাড়ছে। রেণু চলে যেতেই অশোক বেরিয়ে এল, সুমিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল।'

রাস্তায় নামতে নামতে হঠাৎ সুমিতের মনে হল রেণু এখন অনেক অনেক দূরের মানুষ। চট করে কাছে গিয়ে কিছু দাবি করা যায় না। ভালবাসি শব্দটা সেই দূরত্ব অবধি পৌঁছয় না। সুমিত শুনল, একটা ছেলে অশোককে জিজ্ঞাসা করছে, 'কী হয়েছে দাদা কেসটা কী?'

অশোক বলল, 'পারিবারিক ব্যাপার, ও কিছু নয়।'

ছেলেটা আরও কিছু বলে ঝামেলা পাকাবার তালে ছিল আর একজন বলল, 'বিপ্লবদার বন্ধু এরা।'

উলটো রাস্তায় হাঁটতে লাগল অশোক। সুমিত বুঝতে পারছিল ও এখন বিপ্লবদের রেস্টুরেন্টটা এড়িয়ে যেতে চায়। খানিকটা দূরে এসে অশোক বলল, 'এই জন্যই শালা আমি প্রেম-ট্রেম করি না। ধর তক্তা মার পেরেক। তুই শালা যদি ডায়মন্ডহারবারে ঘর ভাড়া নিতিস তা হলে আজ আর আফসোসের কিছু থাকত না। মেয়েটাকে চুমু-টুমু খেয়েছিস কখনও, না সেখানেও সতীত্ব।'

সুমিতের সমস্ত শরীর হঠাৎ থর-থর করে উঠল, কিছু বোঝার আগেই ওর হাত উঠে গেল ওপরে। প্রচণ্ড জোরে চড় মারল অশোকের মুখে। ছিটকে সরে গিয়ে দু হাতে মুখ চেপে ধরল অশোক। ও এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল। সুমিত যে ওকে মারতে পারবে হয়তো চিন্তার বাইরে ছিল ওর। চড় মেরেই সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল সুমিতের। ও চোখ বন্ধ করে অন্ধকার দেখল।

সুমিত শুনল অশোক বলছে, 'সাবাস। চল, এবার নিশ্চয়ই মদ খাবি তুই। তোদের মতো দেবদাসদের পাছায় জোড়া লাথি মারতে হয়।'

সুমিত কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ও দেখল ওর চোখে জল এসে যাচ্ছে। ও প্রাণপণে শক্ত হতে চাইল। অশোক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কাছে এসে বলল, 'চল, কফি হাউসে গিয়ে একটু আড্ডা মারা যাক।'

সুমিত এই প্রথম বুঝতে পারল চোখের পাতার আড়াল বড় পলকা, এক বিন্দু জোর নেই।

তিন তিনটে দিন যেমন যায়, তেমনই চলে গেল। না, রেণুর দেখা পেল না সুমিত। রেণু য়ুনিভার্সিটিতে আসছে না। ভীষণ রকম আশা করেছিল সুমিত, রেণু ওর কথা রাখবে। চতুর্থ দিন, সকালে অশোক এল হোস্টেলে, এসে বলল, 'তোর রেণুর বিয়ে।'

তিনদিন ধরে বুকের মধ্যে কে যেন বসে ফিসফিস করে বলছিল এরকম কিছু হবে, এরকম কিছু হবে। অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সুমিত। অশোক কথাটা কী ভাবে বলবে, এই নিয়ে অস্বস্তিতে ছিল, সোজাসুজি বলতে পেরে খুশি হল, 'একদিক দিয়ে দ্যাখ ভালই হয়েছে। পড়াশুনা ছেড়ে তুই চলে যেতিস চা-বাগানে কিন্তু সুখী হতে পারতিস কি না সন্দেহ। রেণুর মতো অস্থির মনের মেয়েকে নিয়ে সুখী হওয়া যায় না। বরং আমি বলব এটা তোর শাপে বর।'

অনেকক্ষণ বাদে সুমিত কথা বলল, 'তুই জানলি কী করে?'

'আজকে আবার বিপ্লবের সঙ্গে দেখা। সকালে ফেয়ার্লি প্লেসে গিয়েছিলাম হায়দরাবাদের টিকিট কাটতে ওখানে ও এসেছিল। বলল আমরা যেদিন যাই সেদিন নাকি পাত্রপক্ষ এসে ওকে দেখে-ফেকে গেছে। তুই ভাব, ও দুপুরে তোর সঙ্গে রেজিস্ট্রি করবে কথা দিয়ে তোকে অপেক্ষা করিয়েছে, আর বিকেলে সে সেজে পাত্রপক্ষের সামনে বসে 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গেয়েছে। তুই বলতে চাস ও জানত না? একশোবার জানত। এখন বোঝ এই জাতটা কীরকম।' বলে উঠে দাঁড়াল অশোক, 'সামনের সোমবার আমি কাটছি।'

সুমিত অশোককে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়েটা কবে জানিস?'

মাথা নাড়ল অশোক, 'না, তা বিপ্লব জানে না। আচ্ছা, আমাকে তোরা একটা ফেয়ারওয়েল দিবি না, এই যে আমি চলে যাচ্ছি তুই তো কিছু বলছিস না?'

হাসল সুমিত, 'ফেয়ারওয়েল! সেটা তো অনেকেই দিতে হয়, হয় না?'

'যাচ্চলে। তোকে নিয়ে কিছু হবে না। আমি কাটছি এখন, যাবার আগে বেশ জোর আড্ডা মারব কিন্তু।'

সেদিন বিকেলের ডাকে চিঠিটা পেয়ে গেল সুমিত। বেশ মোটা খাম। ওপরে সুন্দর করে সুমিতের ঠিকানা লেখা। বাঁদিকে কী লিখে কেটে দিয়েছে রেণু, কাটা অক্ষরগুলোয় কালি বুলিয়ে দিয়েছে।

চট করে প্রথমেই একটা নদীর কথা মনে পড়ে।

য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে দরজায় লেটার বক্সে পড়ে থাকা খামটা নিয়ে সুমিত দ্রুত নিজের ঘরে চলে এল। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে, কী লিখেছে রেণু? এখন, সব যখন শেষ, কী বাকি থাকে বলার! সান্ত্বনা না কৈফিয়ত? কী মনে হতে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

খামটা খুলতেই এই সন্ধেবেলার ঘর আশ্বিনের পুজো পুজো রোদ্দুরে মাখামাখি হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গ্লসি পেপারে প্রিন্ট করা ছবিটাকে সামনে ধরলও রেণু ঘাড় কাত করে হাসছে। মাথার দুপাশে চুলের গোছা যেন পোস্টকার্ড সাইজের এই ফটোটা ধরে রাখতে পারছে না। সেই গভীর কালোর পটভূমিতে ওর ফরসা মুখখানা ঈষৎ উপরে তোলা, রেণু হাসছে। হাসলে ওর গজদাঁত দেখা যায়। আর কী আশ্চর্য, বড় বড় যে চোখে খুশির ঝিলিক, সে চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডাইনে বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে সে চোখের মণির আড়াল হতে পারল না সুমিত। কপাল রেণুর একটু বড়, তাতে টিপ পরেছে খুব বড় করে। মুখ ওপর করা বলে রেণুর নরম গলা সবটুকু দেখা যাচ্ছে। নীচে ছোট্ট গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'এই আমি রেণু।' চোখ বন্ধ করে ফেলল সুমিত। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলে উঠলে, এই আমি রেণু। ছবিটার ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে আসছে, রেণুর হাতের গন্ধ। ভীষণ চেনা। এই গন্ধ কতদিন থাকবে? মানুষ কতদিন তার সুবাস রেখে যেতে পারে স্মৃতিতে।

সঙ্গে আসা পুরু চিঠি খুলল ও। চিঠিতেও সেই হাতের গন্ধ। চার ভাঁজ করা সাদা কাগজে লেখা চিঠি। না, কোনও সম্বোধন নেই। ওপরের ডানদিকে গতকালের তারিখ। শুরুতেই কী লিখে কেটে দিয়েছে রেণু। কাটা জায়গাগুলো কেটে একবারে তৃপ্তি হয়নি, বার বার কালি বুলিয়ে শেষে একটা নৌকোর মতো চেহারা করে দিয়েছে। এটা ওর মজার খেলা। কিছু লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে গেলেই ও রবীন্দ্রনাথের নকল করত। ও কি এটা অন্যমনস্ক হয়ে করেছে? কে জানে। তারপরই দুমদাম করে শুরু হয়ে গেল চিঠিটা 'আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে—'

দুই

দোতলার বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ছিল বরেন, বরেন মুখার্জি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। চুপচাপ বসে সামনের রাস্তায় একটু আগে জ্বলে ওঠা আলোগুলো দেখছিল ও। একটু একটু বাতাস দিচ্ছে। যেহেতু ওদের ফ্ল্যাটের দক্ষিণটা খোলা, হাওয়া আসে খুব। এই বারান্দায় এমনই ভাবে বসে থাকা ওর খুব প্রিয় অভ্যাস। ইদানীং কাজের চাপ বেড়েছে অফিসে। যে পোস্টে ও কাজ করে সেখানে এটাই স্বাভাবিক আর তা নিয়ে কোনও অভিযোগ ওর নেই। চার অঙ্কের দু ঘরের মাইনে ওকে মুখ দেখে দেওয়া হয় না।

পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরাল বরেন। নীরেন বাইরে এল। বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে নীচের দিকে দেখল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রজবিলাস আসেননি?'

প্রথমে ঠাওর না করলেও বরেন বুঝল প্রশ্নটা। ঘাড় নেড়ে বলল, না। নীরেন বলল, 'লোকটা গুড ফর নাথিং। তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? আমি একদিনে টাইট করে দিতাম লোকটাকে।'

বরেন হাসল। এই কথাটা নীরেন ওকে অনেকবার শুনিয়েছে। সে রকম ইচ্ছে হলে বরেন নিজেই তো কত কী করতে পারত। তার জন্য নীরেনের কলেজের বন্ধুদের দরকার নেই। নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি সামান্য প্রয়োগ করলেই ছেলেটি শেষ হয়ে যেতে পারে। ইদানীং নীরেন যাকে লোকটা বলল, তাকে ও ছেলেটা ভাবছে। কত আর বয়েস হবে। নিঃসন্দেহে ওর থেকে ছোট হবে। অনেক ছোট। চোখ থেকে চশমা খুলে দুই আঙুলে চোখের পাতা চেপে ধরল ও। এখন সবকিছু ভেবেচিন্তে করতে হবে। তার যে বয়েস নীরেন সেখানে এলে নিশ্চয়ই এমনই করত। প্রায় আঠারো বছরের ছোট ও। খুব লজ্জা লাগত তখন। বন্ধুদের বলতে পারত না ওর ভাই হয়েছে। সেই ভাই এখন এত বড়সড় অল্পেই

উত্তেজিত হয়। এই আটত্রিশ বছর বয়সে শরীর ঠিক আছে বরেনের। একটুও মেদ জমেনি, শুধু সামনের চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে এই যা। আর যেমন হয়ে থাকে, ওর মুখের ওপর সেই ছোট ছোট রেখাগুলো এই ক'মাসে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

'ওকে তুমি যেতে দিয়ে ভাল করোনি দাদা।' নীরেন বলল।

'আমি যেতে দিইনি, ও গিয়েছে। ওর বাবাকে আমি সম্মতি দিইনি, কিন্তু—।' এইখানটাই বিশ্রি লাগছে ওর। ও এতে আপত্তি করেছে তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে রেণু চলে গেল। রেণুর বাবার সামনে বরেন ওকে বলেছিল, 'তুমি চলে যাচ্ছ এবং এটা তোমার শেষ যাওয়া হতে পারে, ভেবে দ্যাখো।' একটাও কথা বলেনি ও, মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিল। ওর বাবা ট্যাক্সি ডেকে আনতে সোজা নেমে গেল নীচে।

নীরেন একটু উশখুশ করল। ইদানীং দাদার সঙ্গে ও সব কথা খোলাখুলি বলার সাহস পাচ্ছে। বিয়ের পর থেকে হঠাৎ দাদার সঙ্গে ব্যবধানটাও কমে গেছে ওর। বাইরে ও যে সব বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয় দাদা তাদের কোনওকালেই পছন্দ করে না। এখন সব ব্যাপারেই কেয়ার করি না একটা ভাব এসে গেছে নীরেনের মধ্যে। পাড়ায় ও এখন নেতা গোছের, বাড়িতেও সেই ভাবটা একটু একটু করে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে বলে বরেনের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা বলার সময় কোনও সংকোচ বোধ করে না ও আজকাল।

'ওর কথা শুনে ওরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে চিঠিটা উদ্ধার করতে।' নীরেন আবার বলল। বরেন তাকাল ভাই-এর দিকে, তারপর হাসল, 'তোর কি মনে হয় টাকার লোভ গায়ের জোরের কাছে হেরে যাবে?'

কথাটা শুনে একটু কাঁধ নাচিয়ে নীরেন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাতেই বলে উঠল, 'ওই যে আসছেন। হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে না কোনও ভাল খবর আছে।' বরেন সোজা হয়ে বসল, 'ব্রজবিলাস?' নীরেন ঘাড় নাড়ল, তারপর ঘরের ভিতর চলে গেল, বোধহয় দরজা খুলে দিতে।

নীরেনের চলে যাওয়া দেখল বরেন। ভাই-এর মতো কৌতূহল ওর ভাল লাগছে না। ওর সামনে বা ওর সঙ্গে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কোনও আলোচনা করতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। কিন্তু রেণু এমন সব ব্যাপার করে বসল, যা কারো সামনে থেকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। এখন ব্রজবিলাস আসবে, ওর সঙ্গে যদি একা কথা বলা যেত। কিন্তু বরেন দেখল ব্রজবিলাসকে বারান্দায় নিয়ে এল নীরেন, এসে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল।

রোঁয়া ওঠা টেরিলিনের শার্ট পরে ব্রজবিলাস বাঁ হাতের কনুই-এর ওপর লাল সুতোয় বাঁধা পেতলের তাবিজ ডান হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ছুঁচল, চোখ দুটো বরেনের পায়ের দিকে নামানো।

বরেন বলল, 'বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে কথার ফোয়ারা ছুটল, ব্রজবিলাস হাত পা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'যেন বরেনের অনুমতির জন্য চুপ মেরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, 'কী বলব স্যার, মেরে একদম ফ্ল্যাট করে দিয়েছে, হাড়গোড়গুলো যে কী করে আস্ত থেকে গেল ভগবান জানে। মুখটা যদি একবার দেখতেন, কাটা পাঁঠার মতো রক্তে মাখামাখি।'

'কাকে মেরেছে? কে মেরেছে?' নীরেন চটপট জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের পার্টিকে। দুদিন ধরে জপিয়ে জপিয়ে কিছুতেই টোপ গেলাতে পারছি না। তা আমিও তো ছাড়ার পাত্র নই, এর চেয়ে কত বড় শক্ত কেস—। এই সেবার বালিগঞ্জ প্লেসের এক জাঁদরেল মেয়েছেলে—।'

হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিল বরেন, 'কাজের কথা বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল ব্রজবিলাস, 'রেফারেন্স স্যার, আপনি বুঝতে পারতেন। তা আমি পার্টিকে সকালে বলেছিলাম যে অফিস ছুটির পর ওর সঙ্গে দেখা করব। সেইমতো আমি ঠিক সময়ে হাজির। দেখি মিনিট পনেরো বাদে উনি বেরোলেন। তারপর সোজা গভর্নমেন্ট প্লেস দিয়ে রাজভবনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু নিরিবিলিতে ধরব বলে আমিও পেছন পেছন যেতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি ঠিক নিরিবিলি নয়, আরও কয়েকজন এ পাশ ও পাশে আছে।' একটা ঢোঁক গিলল ব্রজবিলাস। একবার

ভাবল কাল রাত্রে সুমিতের ঘরে যারা ঢুকেছিল তাদের কথা বলবে কি না। তারপর নিজের মনেই মাথা নাড়ল, এতসব বললে ক্লায়েন্ট ঘাবড়ে যাবে। সব কথা খুলে বলা ঠিক নয়। 'তারপর স্যার আমি গন্ধটা পেয়ে গেলাম। কেস খুব খারাপ। একবার ভাবি পার্টিকে সাবধান করে দিই, কিন্তু স্কোপ পেলাম না আর। ওরা ওকে ঘিরে ধরল। যা ধোলাই দিল না স্যার, আপার কাট, লোয়ার কাট, পাঞ্চ, এক সময় আমি বক্সিং শিখেছিলাম তো। নাইনটিন ফরটি এইটে এক পাঞ্জাবির সঙ্গে—।'

ধমকে উঠল বরেন এবার, 'আপনার কথা কে শুনতে চাইছে তারপর কী হল বলুন।'

'বলছি স্যার, এটা একটা রেফারেন্স, হ্যাঁ উনি তো পাকা কুলের মতো টুপ করে মাটিতে খসে পড়লেন। মেরেই ফেলত হঠাৎ দেখি বউদিমণির দাদা এসে ওকে আগলে রাখলেন। প্ল্যানটা বুঝলেন স্যার, প্রথমে ধোলাই তারপর প্রেম। কী বলল বুঝতে পারলাম না আমি, হাওয়াটা স্যার খচরামি করে তখন উলটো দিকে বইতে আরম্ভ করেছিল। তারপর দেখি ওকে ফেলে রেখে সব হাওয়া। আমি দেখলাম এই একটা জোর সুযোগ। দৌড়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওর পাশে গিয়ে ওকে টেনে ট্যাক্সিতে তুললাম। কী বলব স্যার, এমন মেরেছে না। রুমাল কেন, গামছা দিয়েও সব রক্ত পরিষ্কার করতে পারিনি আমি।'

বরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আপনি দেখেছেন ও রেণুর দাদা? সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল ব্রজবিলাস, 'একদম কারেক্ট স্যার।'

'আপনি ওকে চিনলেন কী করে?' বরেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। বিনয়ে মুখ নামাল, 'স্যার এটা হল আমার ট্রেড সিক্রেট। জানতে হয়।'

নীরেন বলল, 'কী বলেছিলাম দাদা, শুয়োরগুলো সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকটিভ হয়ে গেছে। তোমাকে বললাম, বউদিকে যেতে দিয়ে তুমি খুব ভুল করেছ।'

'তারপর কী হল?' বরেন পায়চারি করছিল।

'তারপর স্যার আমি অনেক ভাল ভাল কথা বলে, ডাক্তার দেখিয়ে মেসে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম। এখন আমার ওপর একটু নরম স্যার। হাজার হোক, বিপদের সময় এত সেবাযত্ন করলাম, এমনকী ট্যাক্সি ফেয়ার দিতে দিইনি। মনে হচ্ছে টাকার অঙ্কটা একটু যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলেই কাজ হয়ে যাবে। মানে, আজকের এই ধোলাই-এর পর আর কোনও মায়া-মমতা তো থাকার কথা নয়।'

'আপনি নিশ্চিত যে চিঠিটা ওর কাছে আছে?' বরেন বলল।

'হ্যাঁ স্যার। তবে ঘরে রাখেনি। চিঠি যে ওর কাছে আছে, তা আমি মুখ দেখেই বলতে পারি।' ব্রজবিলাস বলল।

হঠাৎ নীরেন উঠে এল বরেনের সামনে, 'দাদা, তুমি একবার আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দাও। আমি আমার পার্টি নিয়ে—।'

মাথা নাড়ল বরেন, 'না, তোমার যাবার দরকার নেই। এটা পাঁচজনকে চেঁচিয়ে বলার মতো সম্মানজনক ব্যাপার নয়।'

নীরেন মুখ তুলে দাদাকে দেখল। তারপর কী ভেবে আর কিছু বলল না, আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর চলে গেল। ব্রজবিলাস বলল, 'স্যার!'

বরেন তাকাল।

'স্যার, টাকার মাত্রাটা যদি আর এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে কাজ হয়ে যাবে।' ব্রজবিলাস বলল।

'কিন্তু চিঠিতে কী ছাঁইপাশ লেখা আছে না দেখে কোনও কথা আমি কাউকে দেব না। যদি মনে হয় চিঠিটা দামি তবে না হয় এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।' বরেন বলল।

'চিঠিটা তো স্যার দামি, আপনিই বলেছেন। বউদিমণি তার লাইফের সব ব্যাপার-স্যাপার খুলে লিখেছেন।' ব্রজবিলাস প্রতিবাদ করল, 'আর ওই চিঠি তো আপনাকে দেখানোর জন্য আমার হাতে দিয়ে দেবে না, দেখতে হলে আপনাকেই যেতে হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল বরেন, 'ঠিক আছে, আপনি কথা বলুন।'

ব্রজবিলাস আর একটু এগিয়ে এল, 'আপনাকে একদম চিন্তা করতে হবে না স্যার, আমি সব ব্যবস্থা

করছি। আজ তা হলে চলি স্যার।'

ঘাড় নাড়ল বরেন। তারপর দেখল ব্রজবিলাস তাবিজ আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল লোকটা, 'আজ অনেক খরচা হয়ে গেল স্যার, ট্যাক্সি ভাড়া, চা—ফা—।'

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল বরেন, 'এবার যখন আসবেন তখন ভাল খবর আনবার চেষ্টা করবেন। আপনার পেছনে অনেক ব্যয় হয়ে যাচ্ছে।'

টাকাটা হাতে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে গেল ব্রজবিলাস। এইসব কথার পিছনে কথা বলতে নেই, অনেক অভিজ্ঞতায় এটুকু জেনে গেছে ও।

ব্রজবিলাস চলে যাবার পর বরেন চুপচাপ বসে থাকল খানিক। ভিতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না। আজকাল মা বাড়িতে আছেন কি না বোঝা যায় না। নীরেন নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে ভীষণ একলা লাগল বরেনের। অন্ধকারে একা বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না, নিজের ঘরে চলে এল ও।

আলো জ্বলছিল ঘরে। চাকরির সূত্রে পাওয়া এই কোয়ার্টারে অঢেল জায়গা, ঘরগুলো কলকাতার বলে মনে হয় না। তবে ইদানীং বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ঘরের দুদিকে দুটো খাট পাতা। আসলে জোড়া খাটটাই খুলে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। মাঝখানে বেতের নিচুপায়া সোফাসেট, টেবিল, ওর উপর ডিম সাইজের নীল কাচ পাতা। মাথার দিকে দেওয়ালের মাঝামাঝি ছোট টিউবলাইটের নীচে সেই বাঁধানো ছবিটা, বিয়ের পরদিন সকালে যেটা তোলা হয়েছিল। পায়ে পায়ে বরেন ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল। ফুলের মালাটা ও খুলে রেখেছিল সেদিন, কিন্তু কপালে পরিয়ে দেওয়া চন্দনের টিপটা এখনও ছবিতে বোঝা যায়। রেণু তাকিয়ে আছে সামনে, ঠোঁট এমন করে চেপে আছে, হাসছে কি না বোঝা মুশকিল। বেনারসি শাড়ির ঘোমটায় রেণুকে সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বেশ বড়, পরিষ্কার চাহনি, কপালটা চওড়া আর তাতে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরা, সুন্দর। বরং ওর পাশে নিজেকে কেমন বেমানান মনে হল বরেনের। সত্যি কি বেমানান? হ্যাঁ, ছবিতে অবশ্য ওকে একটু ভারিক্কি বলে মনে হচ্ছে, মুখচোখ দেখে মনে হয় অবশ্য বয়েস হয়েছে। কিন্তু ওর মধ্যে যে স্মার্টনেস এই বয়সেও আছে সেটা তো চমৎকার ধরা পড়েছে ছবিটায়। একটু বেশি বয়সেই বিয়েটা করেছে ও, কিন্তু সত্যি কি বেশি বয়েস এমন? ছত্রিশ বছর বয়েস কি খুব বেশি হল?

বিয়ে করব না এমন কোনও ইচ্ছে ছিল না বরেনের। যে সময়টাকে লোকে ঠিক বিয়ের সময় বলে তখন নীরেন খুব ছোট। মনে হত নতুন বউ এসে নীরেনকে একটু বড়সড় দেখুক। তা ছাড়া মাও কোনওদিন উচ্চবাচ্য করেননি বিয়ের ব্যাপারে। সাধারণত মায়েরাই উদ্যোগী হয় এ সব ব্যাপারে। কিন্তু বরেন দেখছে মা খুবই নির্লিপ্ত। আত্মীয়স্বজনরা যখন মাকে প্রশ্ন করেছে তখন উনি বলেছেন, একদিন তো করবেই, এত তাড়াতাড়ি কীসের। অবশ্য বিয়ে না করে বেশ চলে যাচ্ছিল ওর। চাকরির ঝামেলায় অষ্টপ্রহর জড়িয়ে থেকে এক ধরনের সুখ পায় বরেন। রবিবারও অফিস যেত মাঝে মাঝে। এই করতে করতে দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ছত্রিশে এসে ঠেকল।

অফিসের কাজে জামশেদপুর যাচ্ছিল বরেন। উঠবে নটরাজ হোটেলে। সুধাময় গাঙ্গুলি যেচে এসে খবরটা দিলেন। ওদের অফিসের পারচেজিং-এর কর্তা সুধাময়। বরেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন। সুধাময় বললেন, ওর এক ভাগ্নি আছে, বিউটিফুল দেখতে, বরেন যদি চায় জামশেদপুরে গিয়ে ওকে দেখতে পারে। মেয়েটিও যাচ্ছে ওখানে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে। কোনও ফর্মালিটিস নেই।

বরেন হেসে বলেছিল, 'বয়েস কত?'

সুধাময় বলেছিল, 'মেয়েদের আবার বয়স। পনেরো পেরিয়ে গেলেই ওরা যে কোনও বয়সের সঙ্গে মানিয়ে যায়। তবে আমার ভাগ্নীকে নেহাত বালিকা ভাববেন না, এম. এ. পড়ে, এবারই পরীক্ষা দেবে। লম্বা চওড়া আছে। এই সেদিন ওকে দেখে আমিই চিনতে পারছিলাম না।'

সেইমতো যোগাযোগ হয়েছিল জামশেদপুরে। কাউকে বলেনি বরেন বেশ কৌতুক লাগছিল। দেখাই যাক, এরকম একটা ভাব ছিল ওর। হোটেলে এসে রেণুর আত্মীয়রাই যোগাযোগ করছিল। বিকেলে জুবিলি পার্কে ওরা বেড়াতে আসবে, জামশেদজি টাটার স্ট্যাচুর নীচে বরেন অপেক্ষা করবে।

আজকালকার মেয়ে, বিয়ের কথা চট করে বলা যায় না বলে এই ব্যবস্থা।

বরেন ইদানীং সাদা জামা আর স্যুট পরত বাইরে গেলে। অফিসেও ওর এই পোশাক। কিন্তু সেদিন ধুতি পাঞ্জাবি পরল। একটু লজ্জা লাগছিল প্রথমটা, কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখে বেশ আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। ধুতি পাঞ্জাবিতে ওকে বেশ ভালই দেখায়। ঠিক পাঁচটার সময় জুবিলি পার্কে পৌঁছে গেল বরেন। বিষ্ণুপুর থেকে ট্যাক্সিতে সাকচি বেশি সময় লাগে না। তবু একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিল ও। জামশেদজি টাটার মূর্তির নীচে দাঁড়ালে পুরো জুবিলি পার্কটাকে চোখের সামনে ছবির মতো মনে হয়। ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেছে পার্কটা। পাহাড় কেটে সুন্দর করে সাজানো গাছগুলো। এখন বিকেলে ফোয়ারাগুলো ছেড়ে দিয়েছে প্রতিটি ধাপে। অনেক নীচে রাস্তা, আর ওপাশে লেক। লেকের মধ্যিখানে একটা আকাশ-ছোঁয়া ফোয়ারা। বরেন সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে তাকাল। বেশ ভিড় হয়ে গেছে এখনই। সুধাময়ের নাম করে আজ যে-ভদ্রলোক গিয়েছিল তাকে দেখতে পেল না বরেন। খুব বাতাস দিচ্ছে, ধুতি সামলানো মুশকিল। বরেন এক হাতে চুল ঠিক করল। এমনিতে ওর চুল বেশ ফাঁপা, সহজেই বাতাসে ওড়ে।

তারপর ওরা এসে গেল। বেশি লোক আসেনি বলে বরেন মনে মনে ধন্যবাদ দিল ওদের। সুধাময়ের আত্মীয় সেই ভদ্রলোক, শ্যামল না কী যেন নাম, সঙ্গে যে বিবাহিতা মহিলা, তিনি অবশ্যই ওর স্ত্রী, আর ওদের পেছনে যে লম্বা এবং সুন্দর মেয়েটি যাকে দেখেই বোঝা যায় গভীরতা কাকে বলে। ওরই সঙ্গে আজ আলাপ করতে হবে—বরেন মনে মনে খুশি হল। আর তখনই ওর মনে হল বয়সের তুলনায় মেয়েটি বড় গম্ভীর। আর সেজন্যেই নেহাত পুঁচকে মেয়ে বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটি যেভাবে ঘাড় সোজা করে হেঁটে আসছে, যেভাবে কী অবহেলায় দুপাশে তাকাচ্ছে—বরেন খুশি হল। এই বয়েসে এসে একটু চটুল লঘু স্বভাবের মেয়েকে বিয়ে করলে নিজেরই ক্ষতি হত হয়তো। বরং এই মেয়েটিকে দেখেই মনে হচ্ছে এর সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু ও এত গম্ভীর কেন? এই বয়েসে?

আলাপ পরিচয় হল। শ্যামল পরিচয় করিয়ে দিতেই রেণু হাত তুলে নমস্কার করল। বরেন লক্ষ করল হঠাৎ রেণুর ভ্রূ একটু কুঁচকে উঠল, ও চট করে শ্যামলের দিকে তাকাল। মেয়েটি এমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে কেন? কথা বলছিল শ্যামলের স্ত্রীই বেশি। শ্যামল হুঁ হাঁ করছে। রেণু চুপ করে বসে আছে বেঞ্চিতে। একটু বাদে, যেমন হয় আর কী, শ্যামল পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে উঠে গেল কথা বলতে। তখন সন্ধে হব হব, পুরো জুবলি পার্কের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। আলোগুলো জলের গা ঘেষে পায়ের নীচে। লাল নীল কাচের মধ্যে দিয়ে আলো ঠিকরে বেরিয়ে এসে পার্কটাকে সুন্দর করে তুলেছে। শ্যামলের স্ত্রীই বলল, 'বাঃ, আপনারা চুপ করে আছেন যে, কথা বলুন।'

শ্যামলের স্ত্রী, দেখেই বোঝা যায়, ওর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা যে-কোনও বয়সের লাইসেন্স পেয়ে যায়। হাসল বরেন, 'আমি ঠিক এ রকম কথা বলতে অভ্যস্থ নই।'

বড় ঠোঁট কাটা মেয়ে শ্যামলের বউ। বলে বসল, 'প্রেম করেননি কখনও?'

বিরক্ত হতে গিয়ে হল না বরেন, 'সে রকম হলে তো আজ এখানে আসার দরকার হত না। তা ছাড়া উনি তো নিতান্তই ছেলেমানুষ।'

শ্যামলের বউ বলল, 'আপনি ছেলেমানুষ বলেছেন, ও কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছে। য়ুনির্ভাসিটিতে ও দারুণ পপুলার। দু-একজন তো পাগল হয়ে আছে ওকে প্রেম জানাবার জন্য। আপনার কেমন লাগছে?'

হাসল বরেন, 'ছেলেমানুষি ব্যাপার সব। তা য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে গেলে ও রকম কাফ লাভ প্রত্যেকের একটু না আধটু থাকেই। এতে আমি কিছু মনে করার দেখি না। ওগুলো যারা আঁকড়ে থাকে, তারা ঠকবেই।' তারপর রেণুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সেই দলে নন?'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রেণু চোখ ঘুরিয়ে নিল, তারপর বলল, 'কী করে বুঝলেন।'

'আপনাকে আমার বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে। আমি কি ভুল করছি?' বরেন হাসল। রেণু কোনও উত্তর দিল না।

এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল ইতস্তত, তারপর শ্যামল ফিরে এল। যাবার সময় একান্তে শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, ও হোটেলে দেখা করবে কি না। হেসে ফেলেছিল বরেন। বলেছিল তার কোনও দরকার নেই। স্ত্রী হিসেবে রেণুকে পেলে ওর ভাল লাগবে। ওর পূর্ণ সম্মতি থাকল।

হোটেলে ফিরে এসে বরেন ব্যাপারটা ভেবে খুশি হচ্ছিল। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের, আর চাপল্যের হালকা ব্যাপার ওর মধ্যে না থাকায় বরেনের মনে কোনও দ্বিধা নেই। তবে বয়েসে ছোট, অন্তত বছর পনেরো তো হবেই। এটাকে যদি ঘাটতি বলা যায়, তবে সেটা ও মিটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কথা হল রেণু কি জানত ওরা জুবিলি পার্কে আসছে বরেনের সঙ্গে দেখা করতে। যদি শ্যামলের পরিকল্পনা আগে থেকে না জানত, তা হলে নিশ্চয়ই পার্কে বসে বুঝতে পেরেছে। বরেন ভাবতে চেষ্টা করল তখন রেণুর ভাবভঙ্গি কেমন ছিল? ও যদি অপছন্দ করত ব্যাপারটা অথবা ওর যদি সম্মতি না থাকত বরেনকে দেখার পর তবে কী ধরনের ব্যবহার করত? নাঃ, এই ধরনের মেয়েকে দেখে মনের কথা বোঝা যায় না—সেটাই যা মুশকিল।

কলকাতায় ফিরে আসার পর সুধাময়কে বলল বরেন, 'ভাল লেগেছে।' খবরটা বোধহয় সুধাময় পেয়ে গিয়েছিলেন আগেই, বললেন, 'কথাবার্তা হোক।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বরেন বলল, 'কথাবার্তার কোনও দরকার নেই। আপনারা একটা দিন ঠিক করুন সেদিন আমার ভাই আর মা একবার দেখে আসবে। এই দেখা মনে পছন্দ করতে যাওয়া নয়—আলাপ পরিচয় করে আসা। আর বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে নিলে ভাল হয়।'

নীরেনকে নিয়ে মা এক সোমবার দেখে এলেন। এমনিতে মা খুব কম কথা বলেন। রাত্রে ফিরে এলে বরেন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখলে?' মা প্রথমে কোনও কথা বলল না। নীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখতে তো বেশ ভালই। তবে এত গম্ভীর হবে কেন এই বয়েসেই। তা ছাড়া বাচ্চা হলে যা ভাবতাম য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েকে কেউ দেখতে এলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে—ওটা ভাল লাগল না।'

মাথা নাড়ল বরেন, 'আহা, এ বাড়ির বউ হিসেবে কী মনে হল?'

'তোমার যখন পছন্দ হয়েছে, আমারও মত থাকল। তবে আমরা তো শুধু ওকেই দেখলাম, ওর সম্পর্কে ওদের পরিবার সম্পর্কে তো কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি, সেটা ভেবে দ্যাখ।'

'আঃ, আমি তো ওর পরিবারকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। আর মেয়েটি যখন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে, তখন শিক্ষিতা বলতেই হবে, দেখতেও সুন্দরী, হালকা টাইপের নয়। ব্যস। আর খোঁজ খবর বলতে যদি বল অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে কি না বা কতখানি ছিল, আমি তাতে কিছু মনে করি না। বিয়ের পর সে সব না থাকলেই হল। আমার মনে হয় সে সব চুকে বুকে না গেলে আজকাল কেউ বিয়ে করে না।'

শেষ রাত্রে লগ্ন ছিল। বিয়ের পর কোনও কথা বলেনি রেণু। বাসর-ঘরের তো ব্যাপারই ছিল না। বসতে না বসতেই ভোর হয়ে গেল। হাঁটুতে চিবুক রেখে রেণু বসেছিল। কনের সাজে দেখতে দেখতে বরেনের মনে হয়েছে ওকে একটু বিশ্রাম নিতে বলা দরকার, খুব ধকল গেছে মেয়েটার ওপর দিয়ে।

কথাটা বলতেই রেণু উঠে দাঁড়াল যেন এতটুকু শোনার জন্য ও অপেক্ষা করছিল। রেণু ভিতরের ঘরে চলে যাওয়ার পর বরেনের মনে হল ঘরটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। শেষ রাতের বাসর জাগায় ভিড় তেমন নেই, যারা ছিল তারাও বোধহয় জেগে থাকতে আর পারছিল না। বরেন মনে মনে ভীষণ হতাশ হল, ও ভেবেছিল বিশ্রাম করতে বললে রেণু নিশ্চয়ই এখানেই শুয়ে পড়বে। শোয়ার তো মোটামুটি ব্যবস্থাই করা আছে এখানে কিন্তু রেণুর ভঙ্গিতে মনে হল ও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেল এ ঘর থেকে চলে যেতে পেরে।

বাসি-বিয়েটা সকাল সকাল হয়ে যাওয়ার পর এই ছবিটা তোলা হয়েছিল। ফটোগ্রাফার ছোকরাটা ওদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রেণুকে বলেছিল 'আপনি ঘাড়টা অমন শক্ত করে দাঁড়াবেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু, এদিকে তাকান, দেখুন তো, দাদা কী সুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ গুড, একটু হাসুন।' কিন্তু সেভাবে হাসেনি রেণু। এই বাঁধানো ছবিটায় রেণু তাকিয়ে আছে সামনে, ঠোঁট এমন করে চেপে আছে, হাসছে কি না বোঝা মুশকিল।

আসলে রেণুর এই হাসির মতো কোনও কিছুই বোঝা গেল না। এ কয় বছরে। আর গতকাল রেণু চলে যাবার পর মা ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, মুখে কিছু বলেননি। এই সময় ধরে বাড়িতে এতকিছু কাণ্ড ঘটে গেল তবু মুখ খোলেননি ওর কাছে। এখন মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা মানে নিজের

অসহায়তাকে প্রকাশ করা—তা কখনও পারবে না বরেন।

মেয়েরা যেদিন বরের সঙ্গে বাড়ি থেকে টোপর মাথায় দিয়ে বেরিয়ে আসে সেদিন কেঁদে ভাসায়। ওই কান্না তাকে মনে করিয়ে দেয় এতদিন যাকে নিজের বাড়ি বলে ভেবেছে সেটা আসলে বাপের বাড়ি। কান্নাটা এতই স্বাভাবিক বরেন তার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখল রেণু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না। শুধু ট্যাক্সিতে ওঠার সময় ওর দাদা দীপক এসে যখন ওর হাত রাখল তখন থরথর করে ওকে কেঁপে উঠতে দেখেছিল বরেন। ব্যস ওই পর্যন্ত। খুব অবাক হয়েছিল বরেন। তারপর ওর মনে হয়েছিল প্রিয়জন মারা গেলে অনেকে চেঁচিয়ে কাঁদে না, চোখের জল পড়ে না, গুম হয়ে বসে থাকে। সে দুঃখটা নাকি ভয়ানক। লোকে বলে কাঁদলে বেঁচে যেত। রেণুরও কি সেই রকম ব্যাপার? তবে এ কী রকম দুঃখ?

ফুলশয্যার খাওয়া দাওয়া চুকতে রাত হয়ে গিয়েছিল। বরেনের দুই বোন যারা বিয়ের পর বাইরে থাকে, এসেছিল বিয়েতে। বউ দেখে তারাও খুশি। তবে ছোট বোন এসে বলেছিল, 'দাদা, বউদি বড় গম্ভীর।' সেই বোনেরাই সাজগোজের ভার নিয়েছিল। এই ঘরই ছিল ফুলশয্যার ঘর। ফুলটুল এনে খুব বাড়াবাড়ি করছিল ওরা। বরেন এতটা পছন্দ করেনি। ওর মনে হচ্ছিল রেণুরও এ সব পছন্দ হবে না। রাত্রিতে সবাই যখন বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করছে তখন বরেন ঘরে এল। ওদের বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্রে আড়িপাতার কথা কেউ চিন্তাও করবে না, এটা বরেন জানে। দরজা বন্ধ করে দেখল রেণু জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন ওর মাথায় ঘোমটা নেই, খসে যাওয়া আঁচলটা কাঁধের ওপর আলতো করে পড়ে আছে। লাল বেনারসিতে ওকে খুব ভাল লাগল বরেনের। আজ অবধি কোনও মেয়ের, যুবতী মেয়ের শরীর স্পর্শ করেনি ও সচেতনভাবে। এবং এতদিন পরে এই ফুলশয্যার রাত্রে রেণুকে, নিজের বউকে পেছন থেকে দেখে ও হঠাৎ একটা নতুন ধরনের উত্তেজনা আবিষ্কার করল।

কাছে গিয়ে বরেন রেণুর কাঁধে হাত রাখতেই ঘুরে দাঁড়াল রেণু। শুকনো চোখের দিকে তাকালে বুকের মধ্যে কেমন শিরশিরানি হয়। সেইরকম চোখে রেণু ওকে দেখল, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলো।' হাসতে চেষ্টা করল বরেন। আচ্ছা বিয়ের, মানে ফুলশয্যার কতদিন বা কতক্ষণ পর্যন্ত মেয়েরা আপনি চালিয়ে যায়?

'কথাটা আপনাকে শুনতে হবে!' রেণুর গলা শক্ত। 'অবশ্যই শুনব। তুমি খাটের ওপর এসে বসো।' বরেন হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে দাঁড়াল রেণু, 'কথাটা এটাই। আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না।'

'কী বলছ?' চমকে উঠল বরেন।

'আমি না বোঝার মতো কিছু বলছি না।'

'কিন্তু কেন? তুমি এখন আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী বলেই তার শরীরটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সব অধিকার পেয়ে গেছেন, তাই না? অবশ্য ঠিকই, এই বয়েসে যখন আমার মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করেছেন তখন প্রথমে এটাই চাইবেন।'

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না বরেন। রেণু কী বলতে চাইছে? বিয়ের পর ওর বন্ধু বান্ধবরা অনেকে স্ত্রী সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। অপরিচিতা মেয়ে স্ত্রী হবার ছাড়পত্র পেয়ে বিয়ের রাত্রেই শরীরের স্বাদ দিয়েছে অনেককে, আবার কাউকে কাউকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সপ্তাহখানেক। আগে মনের সায় আসুক তারপর শরীর। রেণুও কি তাই বলতে চাইছে? কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি এরকম কেন?

'ঠিক আছে', বরেন বলল, 'এখনই তোমার উত্তেজিত হবার কোনও কারণ ঘটেনি। সত্যি তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ।'

'আপনি যা খুশি বলতে পারেন। তবে আমার কথা হল, আপনি অযথা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করবেন না। আর আপনার সঙ্গে ওই বিছানায় শুতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমার জন্যে যদি আলাদা খাট করে দিতে পারেন তো ভাল, নইলে আমি মেঝেতেই শোব।' হিস্টিরিয়া রুগির মতো কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল রেণু।

'কেন?' অনেকক্ষণ পরে বলল বরেন। ছোট্ট শব্দটা ঘরের মধ্যে একবার ঘুরপাক খেয়ে মিলেয়ে গেলেই রেণু মাথা তুলল 'আপনার চাকরি, অর্থ, ব্যক্তিত্ব এ সব পুঁজি করে আপনি সহজেই আমাকে বিয়ে করতে পেরেছেন। কিন্তু মনের দিক থেকে আপনাকে আমি মেনে নিতে পারছি না, তাই।'

'অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার সম্মতি ছিল না।' বরেন ওকে দেখছিল। জানলার দিকে সরে গেল রেণু। মাথা নেড়ে না বলল।

'তা হলে বিয়ে করলে কেন? কেন প্রতিবাদ করোনি?'

এখান থেকে রেণুর চওড়া পিঠ, ঘোমটা নেমে যাওয়া সুন্দর করে বাঁধা খোঁপা বরেন দেখতে পাচ্ছে। ক্রমশ একটা অপমানবোধ, একটা জ্বালা বরেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রশ্নটা করার সময় নিজের অজান্তেই গলাটা জোরে ছড়িয়ে গেছে। এখন নিজের কাছেই নিজেকে অসহায় বলে মনে হল।

রেণু কোনও উত্তর দিল না। ওর পিঠ তির তির করে কাঁপছে, মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ নামানো। বরেন আবার বলল, 'জামশেদপুরে যখন তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আপত্তি করোনি কেন? কেন আমার সামনে ভালমানুষ সেজে বসেছিলে?'

মুখ না ফিরিয়ে এবার রেণু বলল, 'আমার আপত্তির কোনও দাম ছিল না। কেউ শুনতে চায়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন রক্ত উঠে এল বরেনের। কোনও কথা না বলে রেণুর পাশে এসে দাঁড়াল, 'তুমি এরকম নাটক করছ কেন?'

বরেনের শরীর ওর পাশেই এটা বুঝতে পেরেই যেন রেণু সরে দাঁড়াতে চাইল। 'আর কেউ না শুনতে চাক জামশেদপুরেই তুমি আমাকে বলতে পারতে তুমি বিয়ে করতে চাও না। এখন, আমাকে তুমি যে কথা বলছ তা নেহাতই হয় ছেলেমানুষি নয় ন্যাকামো। আমি এ সব একদম সহ্য করতে পারি না রেণু।'

'আমি যা সত্যি তাই বললাম। আপনি যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন।' রেণুর কথাটা শেষ না হতে হতেই বরেন দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল, 'অনেক হয়েছে, আর পারছি না আমি, একটা মানুষ তার ফুলশয্যার রাতে এভাবে সহ্যশক্তির পরিচয় দিতে পারে না, তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ রেণু?' রেণুর শরীর নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বরেন হঠাৎ কেমন নিজেকে সুখী সুখী ভাবতে চাইছিল। এইসব কথা, রেণুর এই আচরণ নেহাতই অভিনয় এই রকম একটা কল্পনা ও করতে চাইছিল। কিন্তু ততক্ষণে রেণু সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে নিজেকে আলাদা করার চেষ্টা করছে। বরেনের গলার কাছে ওর চিবুক বার বার ঘষে যাচ্ছে, দু হাতে বরেনের কাঁধ ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে ও। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল রেণু, 'ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন আমাকে, ইতর, অসভ্য, কামুক।'

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক শক লাগল শরীরে, বরেনের হাত শিথিল হয়ে গেল। আর রেণু দৌড়ে একবার বন্ধ দরজার দিকে গিয়ে কী ভেবে ফিরে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল বরেন, আচমকা ওর কোনও চিন্তা কাজ করছিল না। চোখের পাতা না ফেলে ও রেণুর ছুটে যাওয়া দেখল। খাটের ওপর রেণুর শরীর কাঁপছে, খাটের ওপাশে বিয়েতে পাওয়া বড় সাজ-গোজের আয়না। বরেন হঠাৎ দেখল আয়নাকে রেণুর মুখের একটা দিক, যা কান্নায় কাঁপছে, দেখা যাচ্ছে। আর তার পেছনে একটু দূরে দাঁড়ানো বরেন। নিজের দিকে তাকিয়ে ও চমকে উঠল, অনেক বয়স বেড়ে গেছে যেন হঠাৎই, গিলে করা পাঞ্জাবি ধুতি পরা সত্ত্বেও ওকে কি কামুক দেখাচ্ছে?

আর তারপরই বরেনের খেয়াল হল অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে গেছে বাড়িটা। এতক্ষণ যাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল তারাও যেন চুপ করে গেছে হঠাৎই। রেণুর চিৎকার নিঃসন্দেহেই সমস্ত বাড়িময় ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই শুনেছে কথাগুলো, কাটা কাটা বিষাক্ত শব্দ। এখনই হয়তো দরজায় শব্দ হবে, কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করবে সবাই। ফুলশয্যার রাত্রে নতুন বউ যদি এইসব শব্দ ব্যবহার করে চিৎকার করে ওঠে তা হলে লোকে সহজেই ভাববে বলাৎকার করতে গিয়েছিল। রেণুও কি তাই ভেবেছে? নীরেন, মা এখনই এসে পড়বে। বোধহয় মা এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন, 'খোকা?' লজ্জায় ঘেন্নায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরেন। তারপর দু হাতে মাথা চেপে ধরে ফিস ফিস করে বলল, 'এ তুমি কী করলে রেণু, এ তুমি কী করলে, ছিঃ।'

কিন্তু কেউ এসে দরজায় ধাক্কা দিল না। বিয়ে বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই ঘরটাকে যেন সবাই এড়িয়ে গেল এখন। কারওর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎই কোনও মন্ত্রে যেন সমস্ত বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

চুপচাপ জানলায় ফিরে গেল বরেন। এখন অনেক রাত। রাস্তায় লোকজন নেই। এ পাশের দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় যাওয়া যায়। বরেনের ইচ্ছে হল একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে বসে। কিন্তু ওখানেও লোকজন শুয়ে বসে থাকতে পারে। কারওর সঙ্গে মুখোমুখি এখন দেখা হওয়া—বরেন চেয়ার টেনে নিল। সমস্ত বাড়িটাই যে বিয়েবাড়ি হয়ে আছে!

স্ত্রীর দিকে তাকাল ও। রেণুকে স্ত্রী ভাবতে এখন অস্বস্তি হচ্ছে কেন? ও কী করবে? রেণুর সঙ্গে সম্পর্কটা কীভাবে চলবে? ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না ও এ রকম কেন করল। আজকের যুগে কোনও মেয়েকে নিশ্চয়ই জোর করে বিয়ে দেওয়া যায় না। রেণু যদি কোনও ছেলেকে ভালবাসে তা হলে কেন ওকে বিয়ে করবে? আর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে সেই ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে আসা। তা হলে তো এখন বিয়ের পরেই স্ত্রী হিসেবে নিজের সম্মান আঁকড়ে ধরতে চাইবে ও। সেরকম যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলে বরেন স্বচ্ছন্দে ওকে ক্ষমা করতে পারে। রেণু যদি বলে আমি কাউকে ভালবাসতাম, বরেন সেটা হেসে মেনে নিতে পারে। কিন্তু এই আচরণের অর্থ, নিশ্চয়ই সেই ভালবাসার মানুষকে ও ভুলতে পারছে না। এত স্পষ্ট করে নিজেদের সম্পর্কটা যে ভেঙে ফেলল রেণু তার পেছনে নিশ্চয়ই সেই ছেলেটি রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক না রেখে চললে কি ছেলেটি ওকে কোনওকিছুর আশা দিয়েছে? না নেহাতই প্রতিবাদ এটা, নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, দ্যাখো তোমাকে বিয়ে করতে পারিনি বলে আমি নিজেকেও বঞ্চিত করলাম। কিন্তু ছেলেটি কে? য়ুনিভার্সিটিতে পড়া চালচুলো নেই এমন কোনও বাচ্চা ছেলে?

রেণু এখন উঠে বসেছে। আধো ভাঁজ হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বসে আছে চুপচাপ। কী মনে হতে উঠে দাঁড়িয়ে বরেন বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে বেড সুইচ জ্বেলে দিল।

হঠাৎ রেণু মুখ তুলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?'

বরেন চট করে কোনও কথা বলতে পারল না। ওর ইচ্ছে হল বলে চমৎকার, চমৎকার, এবার কি আমাকে হাততালি দিতে বলো। কিন্তু ও কোনও কথা বলল না।

রেণু আবার বলল, 'আপনি যদি চান বাইরের লোকের কাছে আমি আপনার স্ত্রীর মতো ব্যবহার করব। শুধু পাঁচ বছর আপনি আমার শরীরের দিকে তাকাবেন না। এই অনুরোধটুকু রাখুন।'

হঠাৎ বরেন বলে উঠল, পাঁচ বছর পর আমার বয়স কত হবে জানো? আর পাঁচ বছরের কথা উঠছে কেন?'

রেণু বলল, 'আমি উত্তর দিতে পারব না।'

'তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিচ্ছ, এটা বুঝতে পারছ না।' বরেন খুব অসহায়ের মতো কথা বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না আমি কোনও অন্যায় করিনি, তবু এটা চাপিয়ে দিচ্ছ?'

মাথা নাড়ল রেণু, 'আমার কিছু করার নেই এখন।'

'ছেলেটি কে?' আস্তে আস্তে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল বরেন।

এই প্রশ্নটাই আশঙ্কা করছিল যেন রেণু এতক্ষণ, চট করে মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না।'

'কী করে সে?' বরেন আবার জিজ্ঞাসা করল।

'বলতে পারব না।' রেণু চোখ বন্ধ করল।

'কাছে এল বরেন, এমন একটা ছেলের জন্য তুমি নিজের জীবন, আমার জীবন নষ্ট করছ যার কোনও মেরুদণ্ড নেই, সামান্য ক্ষমতা নেই তোমাকে ধরে রাখার? যাকে তুমি ভালবেসেছ ভেবে এত কাণ্ড করছ সে যে কত বড় অপদার্থ সেটা বুঝতে পারছ না?'

রেণু বলল, 'আপনি চুপ করুন, আমি কোনও উত্তর দিতে পারব না।'

মরিয়া হয়ে গেল বরেন, 'তোমাকে বলতেই হবে ছেলেটি কে?'

'আমি বলব না?' চাপা গলায় বলল রেণু।

'বলতে তোমাকে হবেই, আমি ছাড়ব না।' রেণুর দুটো কাঁধ দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরল বরেন,

'কোথায় থাকে সে?'

'আমি জানি না।' দাঁতে দাঁত চাপল রেণু।

'আমি তোমাকে আজ ছাড়ব না, তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিতে চাইছ, ছেলেটির নাম বলো?' থর থর করে কাঁপছিল বরেন। ওর হাত ক্রমশ বসে যাচ্ছে রেণুর পিঠে, গলায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রেণু ছটফট করছিল। তারপর কী ভীষণ জেদে বলে গেল, 'আপনি আমাকে মারুন, ধরুন যা ইচ্ছে করুন, আমি কিছুই বলতে পারব না।' আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তে হাত উঠে গেল বরেনের, রেণুর সরে যাওয়া মুখে প্রচণ্ড জোরে চড় মারল ও। দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল রেণু, 'আপনি আমাকে মারুন, মারুন, মারুন।'

মুখে কেউ কিছু বলল না, কিন্তু বরেন বুঝল সবাই ওকে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে মুখিয়ে আছে। পরদিন সকালেই সব আত্মীয়স্বজন চলে গেল। ছুটি নিয়ে ছিল ও দিন সাতেকের, বাতিল করে অফিস চলে গেল ও। মা কিছু বললেন না, নীরেন দুবার ওর দিকে তাকাল। রেণু নিজের ঘরেই রয়েছে। বরেন লক্ষ করল নীরেন বউদির সঙ্গে আলাপ করতে গেল না। অথচ কাল সন্ধেবেলায় নীরেনকে রেণুর সঙ্গে খুশি হয়ে কথা বলতে দেখেছে।

দুপুরে সুধাময় এলেন ওর ঘরে। কাজে মন বসছে না, অফিসসুদ্ধ লোক অবাক। এমন কাজ-পাগলা লোক দেখা যায় না—এমন ভাব সবার চোখে। সুধাময় ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ব্যাপার ছুটি ক্যানসেল করলেন যে!'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল বরেনের। এই লোকটাই সব কিছুর জন্য দায়ী। ও যদি খবর না দিত, ঘটকালি না করত তবে আজ ওকে এভাবে—। বরেন বলল, 'দরকার হল না।'

'বাড়ির সবাই কী বলছে, বউ কেমন হয়েছে?' সুধাময় হাসলেন।

মন ঠিক করে ফেলল বরেন। এ ধরনের ন্যাকামি আর ভাল লাগছে না, 'আপনি কিছু জানতেন না?'

'কী?' সুধাময় বরেনের গলার ধরনটা বুঝতে পারছিলেন না।

সামলে নিল বরেন, 'কিছু না।'

'কী ব্যাপার বলুন তো। কোনও গোলমাল হয়েছে না কি? বিয়ের দিন তো কিছু মনে হয়নি। কাল তো দেখলাম বেশ। কী হয়েছে?' সুধাময় কৌতূহলী হলেন।

'আপাতত আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে ওদের বলে দেবেন দ্বিরাগমন না কীসব ফর্মালিটিস আছে, সেগুলোর কোনও দরকার নেই।' বরেন ফাইল টেনে নিল। সুধাময় কী ভাবলেন খানিক, 'রেণু তো ভালই মেয়ে। অবশ্য আমার সঙ্গে যোগাযোগটা অনেক দূরের, তবু আমাকে যদি খুলে বলেন—।'

মাথা নাড়ল বরেন, 'কিছুই বলার নেই।'

সত্যি আর কিছু বলার থাকল না বরেনের। পরপর কদিনে একই ব্যাপার। সেই কান্নাকাটি, কথা-কাটাকাটি, রেণু মাটিতে শুয়ে পড়ল। বাড়িতে ফিরতেই এখন খারাপ লাগছে। মনের মধ্যে রেণুর সেই ছেলেটি বার বার এসে যাচ্ছে। কী করে খোঁজ পাওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত এক রাত্রে ও খেপে গেল খুব। রেণুকে জোর করে ভোগ করার একটা ইচ্ছে, ওর সমস্ত সত্তাকে গুড়ো করে দেবার বাসনায় ও বলপ্রয়োগ করল। প্রাণপণে চেঁচাল রেণু, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, বরেনের গাল থেকে ওর নখের আঁচড়ে রক্ত বেরিয়ে এল। এমন সময় মা দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

এতদিন যা ছিল ঢাকাঢাকি এখন তা দিনের মতো পরিষ্কার বাড়ির সবাইয়ের কাছে। মা-ই আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করলেন, মুখে কিছু বললেন না। নীরেন রেণুকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করতে লাগলে। দীপক নিতে এসেছিল রেণুকে। সুধাময় খবর দিয়েছিলেন বরেনের কথা শুনে। দ্বিরাগমন বাতিল করে দিল বরেন। দীপককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'এসব ঘটনা চেপে বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন?'

মুখ নিচু করেছিল দীপক, উত্তর দেয়নি।

খেপে গিয়েছিল বরেন, 'উত্তর দিচ্ছেন না কেন? ছেলেটার নাম কী?'

'কী হবে এ সব ভেবে।' দীপক বলেছিল, 'ছোটখাটো ভুল যদি কেউ করে থাকে ক্ষমা করে নিন না।'

'ছোটখাটো ভুল? আপনার বোন আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে আর আপনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন?'

ঘাড় নেড়েছিল দীপক, 'আমি সত্যি ওর সব কথা জানি না।'

রেণুকে পাঠায়নি বরেন। দীপককে বলে দিয়েছিল, নিয়ে যেতে পারেন তবে আর ফিরিয়ে দেবার দরকার নেই। রেণু কিছু বলার আগেই দীপক চলে গিয়েছিল। কড়া হুকুম দিল বরেন, রেণু বাড়ির বাইরে যাবে না, কাউকে কোনও চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারবে না। বাড়ির টেলিফোনে তালাচাবি দিয়ে দিল ও। রেণুকে বলল, 'ফোন এলে তোমার ধরার দরকার নেই, মনে রেখো।'

প্রচণ্ড জ্বালায় কথাগুলো বলেছিল বরেন। জব্দ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে বন্দি হয়ে থাক এখন। ব্যাপারটা যেন মেনে নিয়েছিল রেণু। বরেনের সব কটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে সে। বাপের বাড়িতে যাবার ইচ্ছা একবারও প্রকাশ করেনি। ওর দাদা দুবার এসে ফিরে গেছে। রেণুই আর যেতে চায়নি। বরেনের তো সাফ কথা বলা আছে, দীপক তাই জোর করতে সাহস করেনি। অনেক রাত অবধি অফিসে কাটিয়ে বরেন যখন বাড়ি ফিরত তখন রেণু বলে যে একটা মেয়ে ওদের বাড়িতে আছে তা ভুলে যেতে চাইত। কথাবার্তা তো এমনিতেই বন্ধ। ওর জন্য যে ঘরটা দেওয়া হয়েছে সেখানেই থাকে সারাদিন। দুই আলমারি বই নিয়ে দিন কাটাত প্রথম প্রথম, এখন সম্ভবত ঝি-কে দিয়ে পাড়ার লাইব্রেরি থেকে বই আনায়।

যে ছেলেটির জন্য ওর এত জেদ তাকে খুঁজে বের করতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়েছে বরেনের। কিন্তু নিজের কথা, পাঁচরকম নতুন সমস্যার কথা ভেবে এই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে ও। যেমন চলছে তেমন চলুক। বাকি জীবনটা এইভাবেই দিব্যি কেটে যাবে। মিছিমিছি কাদা ছুড়ে কী লাভ। মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেল চুপ চাপ। শেষ পর্যন্ত একদিন ঘটে গেল ব্যাপারটা। যেন এইটে ঘটাবার জন্য রেণু এতদিন সব মেনে নিয়েছিল।

দুপুরবেলা, বাড়িটা যখন ফাঁকা, কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল রেণু। মা তখন নিজের ঘরে শুয়ে আছে। ঝি-কে দরজা বন্ধ করতে বলে নীচে নেমে এসেছিল ও। ব্যাপারটা নীরেন ওকে বলেছিল বিস্তারিতভাবে।

পাড়ার চা-য়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে নীরেন অবাক হয়ে দেখছিল, রেণু হেঁটে যাচ্ছে, একা। সেই রাত্রের ঘটনার পর ও রেণুকে আর বউদি বলে ডাকে না। কথাই বলে না। বাড়িতে কিছু হলে ও চিৎকার করে বলত, দাদার-বউ। ইদানীং অবশ্য তাও বলছে না।

রেণুকে দেখে ও উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। একবার ভাবল সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, দাদা নিষেধ করা সত্ত্বেও কোন সাহসে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? তেমন দরকার হলে ও রেণুকে হাত ধরে হিড় হিড় করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই মেয়েছেলেটার ওপর ওর কোনও দরদ নেই। একজনের সঙ্গে পিরিত করে ওদের বাড়িতে এসে সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওর নিজের বউ হলে দুবেলা প্যাঁদাতো মেয়েছেলেটাকে। কদিন পুরনো পিরিত আঁকড়ে থাকে দেখা যেত তা হলে।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল নীরেন, হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই থমকে দাঁড়াল। রেণু ওকে দেখতে পায়নি এখনও। মাথায় ঘোমটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাসস্ট্যান্ডের দিকে। কোথায় যাচ্ছে ও? এক, বাপের বাড়ি যেতে পারে নয় সেই প্রেমিকের কাছে। একদম হাতে নাতে ধরা যেতে পারে যদি দ্বিতীয়টা হয়।

খানিক দূরত্ব রেখে নীরেন হাঁটতে লাগল। বাসস্ট্যান্ডে এসে রেণু ঘোমটা খুলে ব্যাগ থেকে একটা কালো চশমা বের করে চোখে এঁটে নিল। নীরেন রিকশাস্ট্যান্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে, ও দেখল রেণু ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে। এখন দুপুরবেলা। তাই স্ট্যান্ডে লোকজন কম। আর এই সময়টায় বাসও কম চলাচল করে। দূরে কোনও বাস দেখতে পেল না নীরেন। পাশেই একটা ওষুধের দোকান। নীরেন চট করে ভিতরে ঢুকে গেল। এখান থেকে রেণুকে দেখা যাচ্ছে। দোকানদার চেনাশোনা, আট আনা পয়সা দিয়ে নীরেন বরেনের অফিসে ফোন করল। নীরেনের গলা শুনে বরেন অবাক হল, 'কীরে কী ব্যাপার!'

'তুমি এখনই বাড়ি চলে এসো।' নীরেন তাড়াতাড়ি করছিল।

'কী হয়েছে?' বরেন বুঝতে পারছিল না।

'উনি বেরিয়েছেন একা একা। বোধহয় কারওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে যাচ্ছি বুঝতে পারছেন না, ওই যে বাস আসছে, তুমি এখনি এসো, ছাড়ছি।' উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলে নীরেন ফোনটা ছেড়ে দিল।

রেণু ততক্ষণে বাসে উঠে পড়েছে, প্রথম দরজাটা দিয়ে। প্রায় চলন্ত বাসের দ্বিতীয় দরজায় উঠে পড়ল নীরেন। ভাগ্যিস বাসটায় বেশ ভিড়, রেণুর চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। দরজার কাছে সেঁটে থেকে নীরেন রাস্তা দেখতে লাগল। কন্ডাক্টর টিকিট চাইলে একটু মুশকিলে পড়ে গেল, একদম ধর্মতলার টিকিট কাটল ও। এর মধ্যেই রেণুকে নামতে হবে নিশ্চয়। প্রত্যেকটা স্টপেজে বাস দাঁড়ালে ও ঝুঁকে পড়ে দেখছিল রেণু নামছে কি না। মহাজাতি সদনের কাছে বাস থামতেই শেষ পর্যন্ত রেণুকে নামতে দেখল। এদিকে ওর বাপের বাড়ি নয়, তা হলে নিশ্চয়ই সেই কেষ্ট ঠাকুরের কাছেই যাচ্ছে। তড়াক করে লাফিয়ে নামল নীরেন। বাসটা চলে যেতেই বিব্রত হয়ে পড়ল ও। এখানে কোনও আড়াল নেই। যদিও রেণু সামনে হাঁটছে তবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেই ওকে দেখতে পেয়ে যাবে। পেলে আর কী হবে, এগিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এই যা। তার মানে কেষ্ট ঠাকুরকে আর ধরা যাবে না। দূরত্বটা বাড়াতে লাগল নীরেন। তারপর হঠাৎ ও চমকে দেখল হাত বাড়িয়ে রেণু ট্যাক্সি থামল। ব্যাপারটা বুঝবার আগেই রেণু ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে। দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরবে ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সিটা চলে গেল বাঁদিকে। হতাশ চোখে ব্যাপারটা দেখল নীরেন। ওর পকেটে বেশি টাকা নেই এখন, ট্যাক্সিতে চেপে ফলো করা অসম্ভব। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে নীরেন ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

দরজা খুলে বরেন দেখল রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ও যে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসবে বোধহয় ভাবতে পারেনি রেণু। বরেন দেখল রেণুর মুখে গলায় ঘাম, যদিও এখন ভয় পেয়েছে তবু চোখ দুটোতে কেয়ার করি না ভাব। আজ দুপুরে নীরেনের ফোন পেয়ে প্রথমে ভাই-এর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল ও। মনে হয়েছিল নীরেন যেন বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করছে। ও ভুলে গিয়েছে বরেনের থেকে বয়েসে ও অনেক ছোট এবং রেণু বরেনের স্ত্রী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখল, নীরেন যেটা করেছে সেটা অল্পবয়সি উত্তেজনায় করেছে কিন্তু রেণু কেন যাবে তার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও। খানিক আগে নীরেন ফিরে এসেছে। রেণু নাকি টের পেয়েছিল যে নীরেন ওকে ফলো করেছে তাই পাকা ক্রিমিনালের মতো নীরেনকে এড়াতে চট করে বাস থেকে নেমে ট্যাক্সি ধরেছিল। এটা থেকেই বোঝা যায় রেণু এমন কোনও কাজ করতে যাচ্ছিল যা সে চাইছিল না নীরেন বা আর কেউ জানুক। আর এই সময় বরেনের চোখে পড়ল রেণুর হাতে শাঁখা নেই। প্রথম যখন বাড়িতে এল তখন মা ওর সামনে রেণুকে বলেছিলেন, 'আজকাল তো মেয়েরা শাঁখা পরতে চায় না দেখছি, কিন্তু তুমি তা কোরো না। এটা একটা গয়নার মতো, দেখতেও বেশ লাগে। তা ছাড়া এবাড়ির এটাই নিয়ম।'

মাথা গরম হয়ে গেল বরেনের। এতক্ষণ ভেবেছিল খুব ভদ্রভাবে মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে রেণুর সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু হাতের ওপর চোখ রেখে ও চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

এখন বিকেল। আশেপাশের ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দায় মেয়েরা বাচ্চারা বসে আছে। রেণু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে, মাথাটা নিচু করল।

'আমি জানতে চাই কোথায় গিয়েছিলে?' বরেন আবার বলল, 'তোমাকে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বেরোও এত সাহস!'

রেণু কোনও কথা বলল না। যেন ওর কানে কোনও কথাই ঢুকছে না। বরেন দেখল পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। রাগে ওর শরীর জ্বলে গেল, হাত বাড়িয়ে ও রেণুকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। রেণুর হাত এখনও বরেনের মুঠোর মধ্যে ধরা, 'কোথায় গিয়েছিলে?' চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল বরেন। অবাক হয়ে তাকাল রেণু, যেন বরেনের এই গলার স্বর ওকে বুঝতে পারছে না।

'কাজ ছিল।' শেষ পর্যন্ত রেণু বলল।

'কী কাজ?'

'ব্যক্তিগত।'

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের উলটোপিঠে চড় মারল বরেন। সটান গিয়ে গালে লাগল হাতটা, ছিটকে পড়তে গিয়ে রেণু পড়ল না, ওর হাত তখনও বরেনের ডান হাতের মুঠোয় ধরা।

'তুমি আমার স্ত্রী। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু থাকতে পারে না। যার কাছে গিয়েছিলে তার নাম বলো।'

অদ্ভুতভাবে হাসল রেণু, 'আমি অক্ষম। নিজের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে দাবি জানাচ্ছেন আবার হাত তুলতেও পারছেন তার গায়ে, বাঃ।'

রেণুর এই হাসিটা আরও জ্বালা ধরিয়ে দিল ওর মনে। এলোপাথারি চড় মারতে লাগল ও, 'তোমার মতো বেশ্যার গায়ে হাত তুললে কোনও অপরাধ হয় না, এটা জেনে রাখো, রাখো রাখো।'

শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল রেণু। কান্না মেশানো 'ও মাগো' শব্দ দুটো বোধ হয় আশেপাশের সব ফ্ল্যাটেই পৌঁছে গেল। হাঁপিয়ে পড়েছিল বরেন, চেয়ে দেখল মা দরজায় দাঁড়িয়ে। বরেন তাকাল মায়ের দিকে। রেণু হাঁটু গেড়ে বসে আছে। পাশেই মেঝেতে ওর ব্যাগ পড়ে। ব্যাগের মুখটা খোলা। চুলের কাঁটা, পাউডারের কৌটো, একটা ছোট্ট পার্স আর দুটো সাদা শাঁখা বেরিয়ে এসেছে ব্যাগ থেকে। নিচু হয়ে শাঁখা দুটো তুলে নিল বরেন, 'এগুলো হাতে পরে যাওনি কেন? তার সেন্টিমেন্টে লাগবে বলে?'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রেণু। চোখ তুলে শাঁখা দুটো দেখে মাথা নিচু করল আবার, 'আপনার মাকে অসম্মান করা হত।'

পাগলের মতো বলে ফেলল বরেন, 'দ্যাখো মা দ্যাখো, তোমাদের বাড়ির বউ তোমাকে কত সম্মান করে! তার মানে তুমি স্বীকার করছ তুমি সেই ছেলেটির কাছে গিয়েছিলে!' বলতে বলতে আবার ছুটে যাচ্ছিল বরেন রেণুর দিকে, হঠাৎ মায়ের গলা শুনে থমকে দাঁড়াল ও। মা বললেন, 'খোকা!' শব্দটার মধ্যে এমন কিছু ছিল বরেন মুখ ফিরিয়ে তাকাল, কিন্তু ততক্ষণে মা ভিতরে চলে যাচ্ছেন আবার। মায়ের এই উপস্থিতি, কিছু না বলে সব দেখা, তারপর ওর নাম ধরে চাপা ডাক—বরেন কেমন অসহায়ের মতো শূন্য দরজার দিকে তাকাল। তারপর কোনও কথা না বলে ও নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। ভিতরের বারান্দায় নীরেন দাঁড়িয়ে আছে তখন, বরেন দেখল নীরেনের মুখটা বেশ তৃপ্ত। চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল বরেন ভাইকে, তারপর হঠাৎই নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ওর মনে হল এখন আর কিছু করার নেই, কিছু না।

এখন রেণুকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায়। বলে দেওয়া যায় ওকে আর দরকার নেই। কিন্তু তাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? আজ যদি পাঠিয়ে দেবার পরে রেণু বলে ওর পেটে সন্তান এসেছে আর তার পিতা বরেন তা হলে ও কী করবে? যার জন্যে রেণু মুখ বুঁজে মার খাচ্ছে, নিজের এবং বরেনের ভবিষ্যৎ ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে বাধছে না তার জন্য এবং তার সঙ্গে রেণু যা খুশি তাই করতে পারে। আর বাপের বাড়ি যাবার পর তো ও পুরনো প্রেম নতুন করার অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে। এবং হয়তো বলা যায় না, তার ফলভোগ করতে হবে বরেনকে! আর এক হয় বিচ্ছেদের জন্য আদালতে যাওয়া। সেখানে কী প্রমাণ দেবে নিজের পক্ষে। বলবে স্ত্রী ব্যাভিচারিণী, কিন্তু মুখের কথাই তো সব নয়। রেণু যদি আদালতে আপত্তি না জানায় তা হলে ভরতুকির ব্যাপার আছে। যদ্দিন রেণু বিয়ে না করবে তদ্দিন ওকে মোটা খরচ দিয়ে যেতে হবে নিশ্চয়ই। শুধু প্রমাণ চাই এখন। ওকে ভ্রষ্টা প্রমাণ করার রসদ দরকার। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে কোনও লাভ হবে না। বরং এখানেই চোখে চোখে থাক। আর তখনই ওর মনে পড়ে গেল বোসদার কথা। বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন এককালে। রিটায়ার করে এখন একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খুলেছেন। বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া ভাল কেস বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, একদিন দেখা হতেই আফসোস করে বলেছিলেন। বোসদাকে ভার দিলে কেমন হয়! যদি কিছু খরচাপাতি হয় হোক। অন্তত সারাজীবন (যতদিন না রেণু বিয়ে করে বা মারা যায়) ততদিন তো টাকা দিয়ে যেতে হবে না। আর সে টাকার যা যোগফল তা ভাবাও যায় না। রেণু কি ডিভোর্স পেয়ে গেলেই বিয়ে করবে? তখন যদি সেই ছেলেটি কেটে পড়ে? তা হলে তো সর্বনাশ। চিরকাল কাঁধে বোঝা বয়ে নিয়ে চলা। অবশ্য বিবাহবিচ্ছেদ মানে লোক জানাজানি, সবাই বলবে বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে যাওয়ার ফলভোগ করতে হল। আর বিচ্ছেদ চাইলেই তো পাওয়া যাবে না। যতদূর

মনে হয় তার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কতগুলো নিয়ম পালন করতে হয়। উপায় না থাকলে তা করতেই হবে। কী করা যাবে। আর একটা উপায় হল—সমস্ত শরীর শির শির করে উঠল বরেনের। ঠাণ্ডা মাথায় ও কী করে রেণুকে খুন করবে? খুন করে যদি ধরা না পড়ে তা হলে বিনা ঝামেলায় মুক্তি পেয়ে যেতে পারে ও। আমি আমার বউকে খুন করব—ভাবতে গিয়েই মনে মনে বলে ফেলল, অসম্ভব। ওর এত দিনের শিক্ষা, রুচি ওকে কী করে খুন করতে সাহায্য করবে! অবশ্য রেণুর ওপর কোনও দয়ামায়া আর নেই ওর। হাত থেকে শাঁখা খুলে নিয়ে রেণু গিয়েছিল প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে। রাগে আবার জ্বলুনি ধরল বরেনের। ঠিক আছে, আগে বোসদার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাক, বোসদা যদি কোনও প্রমাণ জোগাড় করতে পারেন, তা হলে তো হয়েই গেল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল গ্র্যান্ড হোটেলের তলায় ইংরেজি বই-এর দোকানে ডিসপ্লে করা একটা বই দেখেছিল কদিন আগে। মলাটটা খুব সুন্দর। বইটার নাম 'পয়েজড ফর দ্য কিল।' একবার পড়তে হবে বইটা মনে মনে ভাবল বরেন।

বোসদার নতুন অফিস লর্ড সিনহা রোডে। লাঞ্চের ফাঁকে এক দুপুরে গিয়ে সব খুলে বলল বরেন। আসবার আগে ও অনেক ভেবেছে। এ সব কথা, নিজের অসহায়তার কথা চট করে আর একজনকে বলার জন্য সংকোচ হচ্ছিল ওর। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে নিয়েছে, না, বলাই ভাল। ডাক্তার এবং গোয়েন্দার কাছে কিছু গোপন রাখতে নেই। বোসদার অফিস বেশ ছিমছাম। লম্বা চুরুট মুখে রেখে বোসদা সব শুনলেন। বরেন ভেবেছিল হয়তো বোসদা দুঃখ প্রকাশ করবেন। তা না করে সরাসরি কাজের কথায় এসে গেলেন বলে মনে মনে হাঁফ ছাড়ল বরেন।

বোসদা বললেন, 'যদি কোনও ছেলে এর পেছনে থাকে তবে যে সে য়ুনিভার্সিটিতেই পড়ত এটা মনে করার কী কারণ আছে? একটি মেয়ে তার উনিশ কুড়ি বছর অবধি তো নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কাটিয়েছে। আর যেরকম জেদের কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে দীর্ঘকালের জানাশোনা।'

বরেনট চট করে কিছু বলল না। এটাও তো হতে পারে। রেণুর কোনও বাল্য প্রেমিক থাকতে পারে। দু-এক বছরের য়ুনিভার্সিটিতে জানাশুনায় কোনও মেয়ে কী এতটা রিস্ক নিতে পারে? বরেন মাথা নাড়ল।

'আমার মনে হয় আরও পাঁচ ছয় বছর আগের থেকে খোঁজ করা দরকার। তেমন যদি কোনও ব্যর্থ-প্রেমিক থেকে থাকে তবে প্রমাণ-টমাণ হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুখার্জি, মুশকিলের ব্যাপার হল আমার যে তিনজন এজেন্ট আছে তারা ভীষণ ব্যস্ত। এখন ওদের দিয়ে নতুন কাজ করাতেই পারব না। মাসখানেক পরে হলে হয় না?'

বরেন বলল, 'আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করা যায়—।'

আরও একমাস অপেক্ষা করতে ভাল লাগছিল না বরেনের।

চোখ বন্ধ করে কিছু চিন্তা করে নিলেন বোসদা, 'এক কাজ করুন। মাঝে মাঝে আমি বাইরের কিছু লোককে দিয়ে কাজ করাই। আমি একটি লোককে জানি সে এ সব ঘরোয়া ব্যাপারে এফিসিয়েন্ট। একটু বাজে বকে তবে দারুণ কাজের। কাছিমের মতো গোঁ, কাজ হাসিল করবেই। আমি ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বরেন, 'ঠিক আছে আপনি ব্যাপারটা ভাল বুঝবেন। আর হ্যাঁ, কী রকম খরচ লাগবে যদি জানতাম!'

হেসে ফেললেন বোস, 'আমার এজেন্সি মারফত কাজ করলে অনেক পড়বে। কিন্তু আপনি আমার পরিচিত আর এই লোকটিও আমার এজেন্সির নয়। তাই সরাসরি ওকেই দেবেন কাজ হয়ে গেলে। শ দুয়েক দিলেই হবে।'

শেয়ার বাজারের দালাল, বিয়ের ঘটক, সরস্বতী পুজোর পুরুতে অথবা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ব্রজবিলাসকে দেখলে এর যে কোনও একটা ভাবা যায়। প্রথম দর্শনে ভরসা পায়নি বরেন। কিন্তু বোসদা যখন পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ফালতু হবে না। তা ছাড়া লোকটা নতুন কিছু জিজ্ঞাসা করল না ওকে, সবই যেন জেনে বসে আছে বোসদার কাছে। রেণুদের ঠিকানা নিয়ে চলে গেল। বলল, 'নিশ্চিত থাকুন কাজ হবেই, আগে কাজ তবে পয়সা। শুধু মাঝে মাঝে এক্সট্রা খরচ যদি কিছু হয়—।' হাতের তাবিজ ধরেছিল লোকটা।

ব্রজবিলাস প্রথমদিন যে খবর নিয়ে এল তাতে অবাক হয়ে গেলেও একটু মুষড়ে পড়ল বরেন। কী করে খবর পেয়েছে কিছুতেই বলছে না, বলে ট্রেড সিক্রেট, সোরস বলতে নেই। কিন্তু মুশকিল হল এই ভদ্রলোক এখন বিবাহিত, একটি ছেলের বাবা। ব্রজবিলাস হলপ করে বলল, 'আমি স্যার সিওর ওর সঙ্গে উনি, মানে, মানে, বুঝতেই পারছেন, গাড়িতে করে বেড়াতে যেতেন এখানে ওখানে। পাইলট অফিসার, তবে ইদানীং খুব অসুস্থ, মালফাল খেয়ে লিভারের কিছু বাকি রাখেননি আর। তবে স্যার উনি যে লাস্ট ছয় মাস ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছেন। একদম বাইরে বেরোন না। এটাই যে মুশকিল।'

ব্রজবিলাস চলে গেল আরও খবর আনতে। কী খেয়াল হল রেণুর ঘরে এল বরেন। ইদানীং ও এই ঘরেই থাকে। দুই আলমারি বোঝাই বই এখন ওর সঙ্গে। রেণু তাকাতেই বরেন বলল, 'বিভূতিবাবু এসেছিলেন।'

রেণুর মুখ দেখে মনে হল ও বুঝতে পারছে না কথাটা, বরেন আবার বলল, 'বিভূতি গাঙ্গুলি। পাইলট। চিনতে পারো?'

একটু চমকে গেল যেন রেণু। তারপর মুখ নামিয়ে নিল।

'অনেক কথা বলল।' বরেন খোঁচাতে চাইল।

'ভালই তো।' বরেনের মনে হল রেণু যেন হাসছে। ও যে মিথ্যে কথা বলছে তা যেন রেণু বুঝতে পারছে। অথবা বিভূতি গাঙ্গুলিকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না রেণু। নিশ্চিত বসে আছে। অথচ এর সঙ্গে রেণু ঘুরে বেড়াত, কেন? নিশ্চয়ই একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওদের। সেই সম্পর্কটা এতদিন কি বাঁচিয়ে রেখেছে? ব্রজবিলাস বলেছে লোকটা গত ছয় মাস বাড়িতে আছে তা ছাড়া বউ বাচ্চা সমেত একটা লোকের জন্য কোনও মেয়ে বিবাহিত জীবন নষ্ট করে না এইভাবে।

কয়েকদিন পর আবার এসে হাজির ব্রজবিলাস। ও আসত একটু রাত করে। বাইরের বারান্দায় বসে দরজা ভেজিয়ে দিত বরেন। ব্রজবিলাস এসে তাবিজ আঁকড়ে দাঁড়াল, 'স্যার একটু মুশকিল হয়ে গেছে যে!'

'কী হল?' বরেন খুব উৎসুক।

'পাইলটের সঙ্গে তো ইদানীং কোনও যোগযোগ পেলাম না। তবে স্যার পাইলট ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেককাল আগেই কাটান ছাড়ান হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।' ব্রজবিলাস উশখুশ করছিল।

'কী করে বুঝলেন?'

'না হলে ওই সময়ের পরই একজন অধ্যাপকের সঙ্গে নাকি ওর অনেক ইয়ে টিয়ে ছিল।' ব্রজবিলাস বলে ফেলল।

সোজা হয়ে বসল বরেন। অধ্যাপক! এটাই ঠিক হতে পারে। রেণুর মেন্টালিটির সঙ্গে একজন অধ্যাপককে খুব মানিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক বলতে তো চট করে ইচ্ছাকৃত বা স্বভাবজ গম্ভীর, অনেক পড়াশুনা করে নিজের রুচিবোধ শানিয়ে নেওয়া এক শ্রেণীর মানুষকে মনে পড়ে যায় যাঁরা কতগুলো শাসনের প্রাচীরের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন। তবে ইদানীং এইসব সংজ্ঞা পালটে যাচ্ছে দ্রুত। এখন এই অধ্যাপকটি কোন শ্রেণীর? রেণু যখন—।

মাথা নাড়ল ব্রজবিলাস, 'ওনার সঙ্গে খুব থিকথিকে ভাব ছিল স্যার। একই পাড়ায় থাকত, ব্যাচিলার লোক, রাত বিরেতেও পড়াশুনা বুঝতে যেতেন উনি।'

'গুড গুড, খুশি হল বরেন, 'আরও ডিটেলস চাই।'

'পাওয়া গেলো না স্যার।' আফসোসের ভঙ্গি করল ব্রজবিলাস, 'বছর চারেক আগে অধ্যাপক আমেরিকায় চলে গিয়েছেন পার্মানেন্টলি। ওখানেই বিয়ে করেছেন। সম্প্রতি রমজ বাচ্চা দেশে এসেছিলেন দিন দশেকের জন্য।'

অধ্যাপকের নাম জেনে নিয়ে রেণুকে বলল বরেন। এমন ভাব করে বলল, যেন ও রেণুর সব কথা জেনে যাচ্ছে। অথচ রেণুর কাছ থেকে শুধু অবাক হওয়া ছাড়া অন্য কোনও অভিব্যক্তি পেল না বরেন। যেন অনেকদিন আগে ওর একবার বিকোলাই হয়েছিল, বরেন রেণুকে তা মনে করিয়ে দিল—এই পর্যন্ত।

ব্রজবিলাস এর পরে যার কথা বলল, বিস্ময়ে থ হয়ে গেল বরেন। রেণু সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই

যেন মিলছিল না আর। ছেলেটি নেহাতই লপেটা-মার্কা, ইদানীং পার্টি কালারে ঢোকার চেষ্টায় ছিল, ওয়াগন ব্রেকারের দলে পাওয়া গেছে বলে মিসা হয়ে গেছে ওর। এইরকম একটি ছেলের সঙ্গে রেণু নাকি প্রেম করত। হা ঈশ্বর।

আর একজনের খবর আনল ব্রজবিলাস, সে নাকি রোজ গড়িয়াহাটার মোড় থেকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত রেণুর বডিগার্ড হয়ে যেত। এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না ব্রজবিলাস। তবে এটাও নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল।

মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হল বরেনের। রেণু করেছেটা কী! একটার পর একটা ছেলের সঙ্গে পিরিত করে গেছে ওই বয়স থেকে? কিন্তু মুশকিল হল, এইসব চরিত্ররা এখন কেউ রেণুর সঙ্গে জড়িয়ে নেই। ব্রজবিলাসের কথামতো এরা নানা সময়ে ওর সঙ্গে থিকথিকে প্রেম করে কেটে পড়েছে। গা ঘিনঘিন করে উঠল বরেনের। সেদিন রাগের মাথায় রেণুকে ও বেশ্যা বলেছিল, কথাটা এখন কী রকম সত্যি সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তা হলে এইসব প্রেমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে, রেণু এখন কার ওপর ভরসা করে এ সব কাণ্ড করছে?

এই সময় ব্রজবিলাস আবার খবর আনল, রেণু, নাকি বিয়ের ঠিক আগে একটি ছেলের সঙ্গে ঘুরত। য়ুনিভার্সিটির বন্ধু। সে এখন কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। যেখান থেকে শুরু সেখানেই যেন ফিরে এল বরেন। এখন একটার পর একটা চরিত্রের এইসব পরিণতিতে ওর ভয় হল হয়তো দেখবে এই ছেলেটিও আর নেই রেণুর সঙ্গে জড়িয়ে—বলা যায় না কিছু। বরেনের মনে হল, এই মেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেও অন্য ছেলের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যেতে পারে।

এই রকম একটা দিনে ও গ্রান্ড হোটেলের নীচ থেকে 'পয়েজড ফর দ্য কিল' বইটা কিনে আনল। একটা বাঘ অনেক অনুসরণ করে কোনও জলা জায়গায় ঝোপের আড়ালে এসে ওত পেতে বসেছে, অদূরেই তার শিকার। এবার সামনের পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে লাফ দেবার ভঙ্গি করছে বাঘ, যে কোনও মুহূর্তেই। কী করে খুন করতে হয়। এই ভাবেও ভাবা যায় ব্যাপারটা। পৃথিবীর জটিলতম কিছু খুনের ঘটনা, যে কোনও খুনিরা ধরা পড়েছে কী কী ভুল করে অথবা ধরা পড়েনি কোনও কৃতিত্বে—বিস্তারিত লেখা আছে বইটায়। কেউ যদি চায় স্বচ্ছন্দে ঘটনাগুলো থেকে একটা ফর্মুলা তৈরি করে নিতে পারে যার নাম দেওয়া যায় কী করে খুন করতে হয়।

ব্রজবিলাস কত দূর কাজ করতে পারবে—এখন সন্দেহ হচ্ছে বরেনের। ও যেমন একটার পর একটা নাম এনে হাজির করছে তাতে কত দূর কী করা যায়। কয়েকটা নাম কখনও প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। তার জন্য সলিড কিছু চাই। আর সেটা না হলে ব্রজবিলাসের পেছনে টাকা ঢালা পণ্ডশ্রম হবে। এক এক সময় মনে হচ্ছে রেণুর সঙ্গে সহযোগিতা করে বিচ্ছেদটা করে নেওয়াই ভাল। না হয় প্রতি মাসে মোটা টাকা রেণুকে দিয়ে যাবে ও। এই ঝামেলা, এই মানসিক অশান্তি থেকে তো নিস্তার পাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, কেন সে অতগুলো টাকা দিয়ে যাবে একজন ভ্রষ্টা মেয়েছেলেকে! কোনও যুক্তি নেই এর। টাকাটা তাকে শ্রম দিয়ে রোজগার করতে হচ্ছে আর তার অংশ রেণু মজাসে ভোগ করবে স্রেফ আইনের সুবাদে? না, প্রমাণ চাই একটা কিছু, যা রেণুকে ভ্রষ্টা বলে চিহ্নিত করবে। আর তা যদি না পাওয়া যায়?

রেণুকে নিয়ে ও যদি সানরাইজ দেখতে টাইগার হিলে যায় অথবা গোপালপুরে সমুদ্র স্নানে? সবচেয়ে নিরাপদ এটা। কিছুই না, ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সময় বুঝে একটু ঠেলে দেওয়া। তারপর চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে ওঠা। কেউ সন্দেহ অবধি করতে পারবে না। বইটাতে তো এরকম খুনের কথা বলা আছে। আজকাল খুন করতে কেউ ছুরি বা বিষ ব্যবহার করে না। এক ভদ্রমহিলার পেটে আলসার মতো ছিল। মাঝে মাঝে যন্ত্রণা পেত খুব। চিকিৎসা চলছিল। একদিন ভদ্রলোক শুনলেন স্ত্রীর মাথা ধরেছে। অ্যাসপিরিন খেতে বললেন। কাজ হল। তারপর আবার একদিন হতেই মাত্রা বাড়াতে বললেন। গোটা আটেক অ্যাসপিরিন গুড়ো করে কাগজে ঢেলে স্ত্রীকে দিলেন। খেয়ে বেশ আরাম হল। তারপর ঘণ্টা কয়েক বাদে পেটে যন্ত্রণা। শেষে রক্ত বমি। অনেক চেষ্টাতেও বাঁচানো গেল না শেষ পর্যন্ত। পেটের ঘা সহ্য করেনি অ্যাসপিরিনকে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে গণ্য হল ডাক্তারের কাছে উনি বলেছিলেন মাথা ধরার জন্য অ্যাসপিরিন খেয়েছিল। সে তো খেয়েই

থাকেন, নতুন কিছু নয়। কোনও সন্দেহ নেই তার মনে। স্বচ্ছন্দে করে গেলেন। স্বামী বেচারিকে ছুরি বা গুলি ছুড়তে হল না।

কিন্তু রেণু কী ওর সঙ্গে বাইরে যেতে চাইবে? যদি না বলে দেয় মুখের ওপর। বিয়ের পর হনিমুনে যাচ্ছি এটা এখন বলতে গেলে কেমন হাস্যকর শোনাবে না? একটা কিছু মতলব বের করার চিন্তায় পেয়ে বসল ওকে।

দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছিল। এমন সময় ঝড়ের মতো নীরেন দরজা ঠেলে ঢুকল। তখন ওর কাছে লোক বসে। নীরেনকে একবার দেখে ও বাইরে অপেক্ষা করতে বলল। কাজের সময় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। তা ছাড়া নীরেনকে এই সময় ওর অফিসে আসতে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেল ও। কোনও সীমারেখা মানছে না ছেলেটা ইদানীং ভীষণ বেপরোয়া হয়ে গেছে নীরেন। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস হত না নীরেনের। রেণু এসে ওর সর্বনাশ সবদিক দিয়েই করে দিল! বাকি রাখল না কিছু।

কাজে মন বসল না। নীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে এখন। কিন্তু ওর উত্তেজিত মুখ বরেন দেখেছে, মুখে ঘাম, বোঝাই যায় খুব জোর কিছু জানতে পেরেছে ও। এবং সেটা যে রেণুর বিষয়ে তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায়। নিজের পড়াশুনার চেয়ে আড্ডা আর এইসব ব্যাপারে আগ্রহ ওর বেশি।

মিনিট দশেক পরে সামনের ভদ্রলোক উঠে গেলে ভাইকে ডাকল বরেন। নীরেন এসে চেয়ার টেনে বসল। এখন একটু শান্ত হয়েছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

বরেন বলল, 'কী ব্যাপার, অফিসে আসতে হল কেন।'

নীরেন হাসল, 'উনি আজ বাপের বাড়িতে চিঠি লিখেছেন।'

বরেন চুপ করে ভাইকে দেখল। এই একটা কথা বলতে ও এখানে ছুটে এসেছে? অবশ্যই রেণুকে বারণ করে দেওয়া ছিল ও কোনও চিঠিপত্র যেন না লেখে। তবে এ খবরটা তো বাড়িতে গেলেও দেওয়া যেত। বরেন মনে মনে ঠিক করে নিল, নীরেনকে সরাসরি বলবে যাতে এইসব ব্যাপারে ও নাক না গলায়। কিন্তু তার আগেই নীরেন পকেট থেকে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

খামটা তুলে নিল বরেন। ওপরে দীপকের ঠিকানা লেখা। অবাক হয়ে ও ভাইকে বলল, 'এ চিঠি তুই কোথায় পেলি?'

এবার বেশ উত্তেজিত হয়ে নীরেন ঘটনাটা বলল। যেন একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছে। বাড়ির সামনে একটা রকে বসে আড্ডা দিচ্ছিল ওরা। এগারোটা নাগাদ পাড়া ফাঁকা। এমন সময় ও ওদের বাড়ির ঝি-কে নেমে আসতে দেখল। বুড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে লেটার বক্সের মধ্যে কিছু ফেলে তর তর করে উঠে গেলো সিঁড়ি দিয়ে। প্রথমটা কিছু ভাবেনি নীরেন, কিন্তু বুড়ি ঝি-এর ফিরে যাওয়া দেখে ওর কেমন লাগল। ওদের বাড়িতে চিঠিপত্র আসা যাওয়া করে খুবই কম। এখন বাড়িতে মা আর উনি আছেন! মা তো চিঠিপত্র লেখেনই না। ও অবশ্য বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারত কে দিয়েছে কিন্তু তাতে ব্যাপারটা গোপন থাকবে না।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর পোস্ট অফিসের লোক এসে যখন তালা খুলে চিঠি বের করছে তখন ও মিথ্যে করে তাকে বলেছে যে চিঠিটা ভুল করে ফেলে দিয়েছে লেটার বক্সে। পিয়ন কিছুতেই দিতে চাইছিল না। পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্ট মাস্টারকে বলতে বলেছিল। শেষ পর্যন্ত কায়দা কৌশল করে ও এই চিঠিটা উদ্ধার করেছে। ওর সন্দেহ নিশ্চয়ই এটা দামি চিঠি। কারণ যত দূর মনে হয় উনি এখানে এসে কোনও চিঠি লেখেননি, এটাতে তাই মনের কথা লিখতে পারেন। ওর অবশ্য ভয় ছিল, লেটার বক্সের অনেক চিঠির মধ্যে কোনটা ওদের ঝি ফেলেছে ঠাওর করে উঠতে পারবে না। এটাও তো হতে পারত উনি সেই ছেলেটাকে লিখেছেন। তবে উনার হাতের লেখা নিশ্চয়ই ভাল হবে আর বক্সে কত চিঠিই না থাকতে পারে—এইসব থেকে রিস্ক নিয়েছিল নীরেন। বাপের বাড়ির ঠিকানা থাকায় অবশ্য কোনও অসুবিধা হয়নি খামটাকে চিনে ফেলতে।

কথাগুলো শুনে চোখের কোণে ভাই-এর দিকে তাকাল বরেন। বেশ কৃতিত্বের হাসি ওর মুখে। এটা

অন্তত আশার কথা যে ও খামটা উৎসাহের আতিশয্যে খুলে বসেনি। মুখ ছিড়ে চিঠিটা বের করল বরেন। 'আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। বেঁচে আছি কী করে জানি না। এখন প্রতিদিন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে অনেক রকম। দাদা, তুমি আমার একটা কাজ করবে? তোমাকে যে ছেলেটির কথা বলতাম তার কাছ থেকে আমার একটা চিঠি তুমি ফেরত নিয়ে এসো। কেন ওকে লিখেছিলাম জানি না, মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতি মুহূর্তে কত বোকামি না আমি করে চলেছি। চিঠিটা অনেক বড়, বিয়ের কদিন আগে লেখা। আগে হস্টেলে থাকত সুমিত, এখন পাশেই আর একটা মেসে। বিডন স্ট্রিট ধরে মানিকতলার দিকে এগোতেই হেঁদোর বাঁদিকে। সবাই চেনে। কাজটা দ্রুত করতে হবে তোমাকে। নইলে এ পক্ষ খোঁজ পেয়ে যেতে পারে।' তারপর অনেকটা ফাঁক, 'আমাকে একদিন এসে নিয়ে যাওনা, দাদা।'

চিঠিটা পড়ে চোখ বন্ধ করল বরেন, 'ঠিক আছে, তুই যা।'

'কী লিখেছে?' নীরেন ঝুঁকে বসল।

'আমি তোকে চলে যেতে বলেছি, যা' চাপা গলায় বলল বরেন। ওর মনে হল নীরেনকে কি ও এখন চড় মারতে পারবে না? দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল নীরেন। তারপর কেমন একটা ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিঠিটা সামনে রাখল বরেন, বিডন স্ট্রিটের মেসবাড়িতে থাকে সেই ছেলেটি, যার নাম সুমিত। আর তার কাছেই একটা চিঠি আছে, যার জন্য রেণুর ভয়। খুশিতে উঠে দাঁড়াল ও। এখনই যদি ব্রজবিলাসকে পাওয়া যেত। ওর ভাই, ব্রজবিলাস যা পারেনি তাই পেরেছে। আর হাওয়ার ওপর বসে নেই বরেন, এখন আসল দরজা সামনে। হঠাৎ ওর মনে হল নীরেনকে ওভাবে না বললেই হত। এত বড় একটা উপকার করল ছেলেটা। বরং ওকে কিছু টাকা দিয়ে বললে হত ইচ্ছে মতন খরচ করতে। শেষে নিজেই হেসে ফেলল বরেন। টিপস? নিজের ভাইকে? বাইরে বেরিয়ে ও ফাঁকা করিডোর দেখল। নীরেন চলে গেছে।

রেণু এবং নিজের ছবিটা এবার দেওয়াল থেকে নামিয়ে রাখা দরকার, মনে মনে বলল বরেন। এতদিন ধরে এত সব ঘটে যাচ্ছে অথচ ছবিটার কথা মনে হয়নি একবারও। এখন নিজেদের যা সম্পর্ক তাতে এই ছবিটা বিশ্রীরকমের বেমানান।

রেণু এখন বাপের বাড়িতে। ওই ছোট্ট বোকামিটা যদি ও না করত তা হলে সুমিত নামের এই ছেলেটির কথা জানতে কত সময় লেগে যেত। আর কী আশ্চর্য, বাপের বাড়িতে ফিরে গিয়েই ও চিঠিটা পাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। চিঠিতে কী লেখা আছে কে জানে! নিশ্চয়ই এমন কিছু গোপন কলঙ্কের কথা যা প্রকাশ হতে দিতে চায় না রেণু। আর তার জন্য এই ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারছে সহজেই। সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কী! ওর ভাই যখন লোকজন নিয়ে ছেলেটিকে মারধোর করেছে, তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে রেণুর সম্মতি ছিল। আর এরপর কি ছেলেটা রেণুকে সহজ হয়ে গ্রহণ করবে? অসম্ভব। তা হলে রেণু নিজের বিবাহিত জীবন এভাবে নষ্ট করল কেন? এতে তো দুকুলই হারিয়ে ফেলল। চিঠিতে ও কী এমন কথা লিখেছে? রেণু কি কখনও কনসিভ করেছিল সে সব কথা কি চিঠিতে লেখা আছে? আর তা যদি লেখা থাকে, তা হলে ছেলেটি সে সব ক্ষমাঘেন্না করে নিতে পারবে বলে রেণুর ধারণা ছিল? বুঝতে পারি না আমি, মাথা নাড়ল বরেন, অল্প বয়সের প্রেম বোধ হয় সব কিছু ক্ষমা করে দিতে পারে। এবং এই প্রথম বরেন, সুমিতকে হিংসা করতে লাগল।

যাক, যা হবার তা হয়েছে। এখন আরও কিছু খরচ করে যদি চিঠিটা হাতে এসে যায়, তা হলে একটানে রেণুকে ছুড়ে ফেলে, দিতে পারবে ও। তারপর নিশ্চিত জীবন। যেভাবে এতদিন কেটে গেছে ওর, অন্তত অশান্তি হয়নি।

বারান্দায় বেরিয়ে বরেন দেখল একটা ট্যাক্সি হেডলাইট জ্বেলে এসে ওদের বাড়ির নীচে দাঁড়াল। অলস চোখে ও দেখল একজন মহিলা দরজা খুলে নেমে ভাড়া দিচ্ছেন ড্রাইভারকে। এত ওপর থেকে আবছা আলোয় মহিলার মাথা আর ঘাড় দেখতে পেল ও। বিয়ে করেও আমি একটি নারীর শরীর ভোগ করতে পারলাম না, হেসে উঠল বরেন। মানুষ কী আশায় এবং বিশ্বাসে নিজের কাছে সৎ হয়ে থাকে।

ওদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত সে নাকি ওই বয়েসেই নিয়মিত খদ্দের ছিল। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন যাস?'

'মজা করতে', ছেলেটি বলেছিল, 'রোজ রোজ নিত্যনতুন জিনিস মনে হয় আমারই হারেম। যা আনন্দ হয় না—।' বরেন লক্ষ করেছিল কথাটা বলার সময় ওর কোনও লজ্জা বা পাপবোধ ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য সংস্কারে ওর নিজেরই গা ঘিনঘিন করেছিল তখন।

বাইরের দরজায় কেউ শব্দ করল। কে এসেছে? এখন কারও সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। বোধহয় ঝি দরজা খুলে দিল। ছোট ছোট আওয়াজ উঠছে চটির, মেয়েলি। বারান্দার চেয়ারে বসে ঘাড় ঘোরাল বরেন। দরজায় রেণু দাঁড়িয়ে।

চমকে উঠল বরেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। রেণু দাঁড়িয়ে আছে দরজায় একটা হাত রেখে। পেছনে ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। তাই এখান থেকে ওর মুখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে শরীরের বাহির-রেখায় আলো চকচক করছে। ওর তো আসার কথা ছিল না। এবং যাবার সময় বরেন বলে দিয়েছিল এটা শেষবারের জন্য যাওয়া, তবু কী সাহসে ও ফিরে এল। এখন কোনও কিছুর পরোয়া করে না বরেন। রেণু মুখ নামিয়ে আছে এখনও। ওর হাত কি কাঁপছে?

'কী ব্যাপার?' তিক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল বরেন।

'আমি ফিরে এলাম।' রেণুর মাথা এখনও নীচের দিকে।

'কেন?' বরেন কথা খুঁজছিল।

'আর ফিরে যাবও না বলে।' রেণু এবার মুখ তুলল।

'না!' চিৎকার করে উঠল বরেন, 'তা আর হয় না। তুমি চলে যাও।' হঠাৎ ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। দ্রুত ঘরে ঢুকে ও দেওয়াল থেকে ছবিটা টেনে নামিয়ে ছুড়ে দিল রেণুর পায়ের দিকে। ঝনঝন শব্দ করে কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। চমকে সরে দাঁড়াল রেণু। বরেন দেখল অজস্র কুচি কুচি ভাঙা দাগ ওর মুখের ওপর চেপে বসেছে। একটা হাত বাড়িয়ে ছবি দেখিয়ে বরেন বলল, 'ওটার মতন তোমাকেও যদি ছুড়ে ফেলে দিতে পারতাম!' অদ্ভুত একটা যন্ত্রণায় বরেনের গলার স্বর বুজে আসছিল।

কয়েক পা হেঁটে ঘরের ভিতরে এল রেণু, 'আমি, আমি পারছি না।'

'কী পারছ না, কী মতলব তোমার, বলো? আবার কোনও প্ল্যান করে এসেছ নিশ্চয়ই। তুমি চলে যাও, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, তোমাকে আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই; আই হেট ইউ।' বরেন হাঁপাচ্ছিল।

'আমি ক্ষমা চাইছি, আমি আর অবাধ্য হব না, আপনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুন, আমি, আমি সেই জন্যই এসেছি—।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটা কান্না সামলাল রেণু।

'কেন? তোমার সুমিতবাবু কী বলছে? এত পিরিত দুদিনেই শেষ হয়ে গেল? পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করবে না? এখন বোধ হয় লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে? চিঠিটার জন্য এত প্রেম উড়ে গেল এক নিমেষেই হ্যাঁ।'

'আপনি যা বলার বলুন, আমি সব শুনব, শুধু—।'

'না তা হতে পারে না। তুমি আমার জীবন বিষাক্ত করেছ। তোমাকে মেরে ফেললেও আমার সুখ হবে না। আমি, আমার দিকে লোকে তাকিয়ে হাসে। একবারও তুমি ভাবোনি যে, আমি তোমার কাছে কোনও অন্যায় করিনি। এটা বুঝতে পারছ না কেন, আমি তোমাকে ঘেন্না করি, ঘেন্না করি। তুমি—তোমার চেয়ে বাজারের একটা মেয়ে অনেক ভাল, তার প্রফেসনে সে সৎ থাকে। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে—গেট আউট।'

মাথার ওপর আলো, রেণু দাঁড়িয়ে আছে ঘরের সামনে। বরেন কথা বলতে বলতে ওর দিকে তাকাল। এরকম মুখের দিকে তাকালে বুকের ভিতর কেমন করে। মাথা নাড়ল বরেন, না, আর কোনও ভুল করতে পারে না ও।

'তোমার চিঠি আমি পাবই। তুমি কী বোকামি করেছ রেণু, সুমিতকে মারধোর না করলে বোধহয় চিঠিটা পাওয়া এত সহজ হত না।'

চমকে উঠল রেণু। বরেন বুঝতে পারল মারধোরের খবরটা যে ও পেয়ে যাবে রেণু ভাবতে পারেনি। হা হা হা। প্রাণপণে হাসতে ইচ্ছে করছে এখন। ওর মনে পড়ল সেদিন রেণুর ঘরে গিয়ে ও খুশিতে চিবিয়ে চিবিয়ে কী সুন্দর করে কথাগুলো বলেছিল। আর অন্য নাম শুনে যা হয়নি, সুমিতের নাম শুনেই দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল রেণু। বরেন যখন বলেছিল, 'সুমিত বলে কোনও ছোঁড়াকে চেনো? সে নাকি খুব অর্থকষ্টে কাটাচ্ছে? তাই আমার কাছে একটা মূল্যবান জিনিস বিক্রি করবে—খুব খুব দামি। এখন মুখ ঢাকছ কেন? কী লিখেছ সেই চিঠিতে?' নীরেনের চিঠি পাওয়ার ঘটনাটা বলেনি ও, ওটা বললে মজা কমে যেত।

আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ল রেণু, তারপর দু হাতের মধ্যে মুখ রেখে কেঁদে ফেলল।

কেন ন্যাকামো করছ, তোমার তো এলেম আছে অনেক, এবার আর একজনকে ধরো। এতদিন ধরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এখন আমার কাছে এসেছ মলম বোলাতে? কেন এসেছ? হঠাৎ মতিগতি বদলে গেল যে!' বরেন তারিয়ে তারিয়ে বলল, রেণু কোনও উত্তর দিল না। ওর পিঠ কাঁপছিল। আর এই সময় বরেন লক্ষ করল ও বিয়ের বেনারসিটা পরে এসেছে, গা ভর্তি সেই গয়নাগুলো; হাতে শাঁখা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল বরেন, 'আজ রাত হয়েছে, কাল সকালেই চলে যাবে। আমি একটা বেশ্যার মুখ সকালবেলায় দেখতে চাই না।'

বারান্দা দিয়ে ওঘরে যেতে যেতে বরেন থমকে দাঁড়াল। আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোক মুখ বাড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। রেণু এসেছে সবাই যেন টের বেয়ে গেছে। সবাই একটা নাটক দেখার জন্য সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের উত্তেজিত কথাগুলো কি ওরা শুনতে পেয়েছে। আঃ, মানুষ কেন এত কৌতূহলী হয়। বরেন শুনতে পেল, বাইরের ঘরে ফোনটা বাজছে। মানুষ এত কথা বলে কেন?

তিন

ঘুমিয়ে পড়েছিল সুমিত। দরজায় অনেক শব্দ হবার পর ও চোখ মেলল। তখনও গায়ে ব্যথা। কখন যে সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি একদম। দরজায় শব্দটা একনাগাড়ে হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কপালে হাত রাখল ও, না জ্বর আসেনি।

দরজা খুলতেই ও অবাক হয়ে গেল। দীপক দাঁড়িয়ে।

'কী ব্যাপার!'

'মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। কাল রাত্রে কি রেণু আপনার কাছে এসেছিল? অনেক রাত্রে?'

'না তো। কেন?' ব্যাপার বুঝতে পারছিল না সুমিত।

'আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার এখান থেকে বাড়ি ফিরে ওকে সব বললাম। দেখলাম মুখ গম্ভীর করে বসে আছে। বললাম, আপনি কোনও ক্ষতি করবেন না। ও শুধু চোখ তুলে আমাকে দেখল। বুঝতে পারলাম, আপনাকে মারার ব্যাপারটা ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না। হঠাৎ জিজ্ঞসা করল, 'কেমন আছে?' আমি যা বলার বললাম। তারপর ও কেঁদে ফেলল আর বার বার বলতে লাগল, 'কেন মারলে, কেন মারলে?' ওকে একা থাকতে দিয়ে আমি চলে এলাম অন্য ঘরে। তারপর একসময় মা বললেন, ও নেই। সব জায়গায় খুঁজে দেখতে পেলাম না ওকে। একটা কাগজে লিখে গিয়েছিল, 'আমার অতীতকে ভুলতে চাই, দাদা।' শুনলাম ও নাকি মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে। ভাবলাম ও নিশ্চয়ই বরেনের বাড়ি গিয়েছে। ওকে ফোন করলাম। দশ মিনিট ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। অত রাত্রে আর বেরুলাম না। যাওয়ার পথে এখন আপনার কাছে এলাম যদি এখানে এসে থাকে।'

'না, কেউ আসেনি।' সুমিত বলল।

'তা হলে বরেনের কাছেই ফিরে গেছে। অথচ ওখান থেকে চলে আসার সময় বলেছিল, ওখানে থাকলে ও মরে যাবে! আর ফিরে যাবে না কোনওদিন। অথচ কী তাড়াতাড়ি বদলে ফেলল মতটা। আচ্ছা চলি, বরেনের ওখানেই ওকে পাব নিশ্চয়ই।'

চলে গেল দীপক। দীপকের মুখ চোখ দেখে সুমিতের মনে হল রেণু যে রাত্রে এখানে আসেনি এবং

নিশ্চয়ই বরেনের কাছে ফিরে গেছে এতে ও খুশি হয়েছে। রেণু যদি কাল রাত্রে এখানে আসত? বুকের মধ্যে কী একটা টনটন করে উঠল। যদি ও বলত, আমাকে নাও, আমি আর পারছি না। ভাবতে ভাবতে একটা শীতল জলস্রোত ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস-করা—আইন অক্টোপাসের মতো ওকে আঁকড়ে ধরবে। ভগবানের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে ছাড় পাওয়া নিতান্তই হাস্যকর। কিন্তু রেণু ফিরে গেল কেন? ও তো বরেনের সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্পর্ক কাটিয়ে চলে এসেছিল বাপের বাড়ি। চিঠিটা পেল না বলে নাকি, (মনটা কেমন ভার হয়ে যায়) সুমিতের ওপর মারধোর করা হয়েছে বলে। মনের মধ্যে আর একটা মন কী যে সুখের চিন্তা করে।

টুক করে একটা মেয়ে কত দূরে চলে যায়। যে ছিল হাতের নাগালে যে ছিল ছায়ার মতো—কেমন করে এক ফোঁটা সিঁদুর চারপাশে অনেক লোহার গারদ সাজিয়ে দেয়। সেদিন ভরদুপুরে রেণু এসে হাজির অফিসে। কাজ করছিল সুমিত। নীচের রিসেপশন থেকে ওকে বলল একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। কোনও মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এটা ভাবতেও ভাল লাগে। কিন্তু কে আসতে পারে? ওর কোনও পরিচিতা এই অফিসে নিশ্চয়ই আসবে না। লিফটে নেমে এসে থমকে গেল সুমিত। রেণু বসে আছে ভিজিটার্সদের চেয়ারে। চোখে কালো চশমা। ওকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল। একটু রোগা হয়ে গেছে, মুখ যেন চৈত্র মাসের দুপুরবেলা। রেণুকে দেখেই বুকের মধ্যে, এত দিন কোথায় ছিল কে জানে, অজস্র ঝিঁঝি পোকা একসঙ্গে ডেকে উঠল। পায়ের তলা শিরশির করছিল। ও হাঁটতে পারছিল না যেন। কোনওরকমে কাছে গিয়ে বলল, ' তুমি!' নিজের গলার স্বর কেমন করে যে অচেনা হয়ে যায়। রেণুর চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝাই যায় কালো কাচের আড়ালে ও সুমিতের দিকেই তাকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বলল, 'চলে এলাম।'

সুমিত ওদের রিসেপশনিস্টের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।' ও অফিসের এই পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছিল, ওর ভয় হচ্ছিল বেমানান কিছু একটা করতে ফেলতে পারে।

বাইরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে সুমিত বলল, 'তুমি কী করে জানলে এই অফিসে আমি আছি।'

'আমি জানি, সব জানি।' রেণু বলল। বলল না ট্যাক্সি নিয়ে সুমিতের হোস্টেলে গিয়েছে সেখান থেকে নতুন মেসের ঠিকানা আর নতুন মেস থেকে এই অফিস। এবং এতটা করতে এখন ওর পরিশ্রম হয়েছে অনেক।

'কোথাও বসবে, চা খাবে?' সুমিত তাকাল। এখন রেণুর সিঁথিতে আলজিভের মতো সিঁদুরের আভা হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে। মাথা নাড়ল রেণু, 'বড় দেরি হয়ে গেছে, আচ্ছা, একটুখানি।'

টিফিনের ভিড়টা একটু হালকা হয়ে গেছে বলে ট্রামরাস্তার ওপর ছোট্ট রেস্টুরেন্টের ঘেরাঘরটা পেয়ে গেল ওরা। রেণুর সঙ্গে এই পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে এসে ওর মনে হয়েছে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছে রেণু, যেন ও কার সঙ্গে যাচ্ছে কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। ঘেরাঘরে ঢুকে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চেয়ারে বসতে বসতে সুমিত বলল, 'তুমি কেমন আছ রেণু!'

চোখ থেকে চশমা খুলতে যাচ্ছিল রেণু, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। ছটফট করে উঠল সুমিত। এখন ও কী করবে। এই প্রশ্নটা না করলেই ভাল হত। যেন খুব জানা একটা ক্ষত খুঁচিয়ে দিয়েছে ও। হাত বাড়িয়ে টেবিলের উলটোদিকে বসা রেণুর মাথা ছুঁলো ও, 'রেণু, রেণু।'

বয় এসে দেখল রেণু কাঁদছে। ও কি কিছু মনে করল। বয়ের সামনে খুব গম্ভীর হয়ে থাকল সুমিত। দুটো চা দিতে বলল।

শেষ পর্যন্ত রেণু বলল, 'আমি খারাপ, খুব খারাপ, না?'

এতদিন বুকের মধ্যে যত রাগ ছিল, যত জ্বালা তিল তিল করে বেড়ে গিয়ে মজা পুকুরের মতো শ্যাওলায় ঢাকা ছিল এক নিমেষেই তাকে সরিয়ে দিল রেণু। কোনওদিন দেখা হলে রেণুকে যেসব কটু কথা বলবে বলে একসময় ঠিক করেছিল সুমিত তার একটাকেও এখন খুঁজে পেল না। কী কথা বলবে ও, বুকের মধ্যে এত কথা একসঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্যে মুখিয়ে আছে, কোনটে দিয়ে শুরু করবে।

'আমাকে ঘেন্না করছ না তো!' রেণু চোখ তুলল। দুহাত বাড়িয়ে রেণুর মুখ স্পর্শ করার লোভ হল

সুমিতের। হাতের তালুতে রেণুর গাল মনে মনে অনুভব করল ও। মুখে বলল, 'ছিঃ।'

'আমি কিন্তু এখনও তোমার আছি।' অন্যদিকে তাকিয়ে নিজের মনে যেন কথা বলল রেণু, 'এখনও ওকে স্পর্শ করতে দিইনি। আমি তোমার কাছে কোনও কথা পাইনি, তবু—।'

এই প্রথম সেই কথাটা বলে ফেলল সুমিত, 'তুমি কেন বিয়ে করলে রেণু! আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনি। তোমার অতীতকে আমি সহজেই ভুলে যেতে পারতাম, যেমন তোমার এই বর্তমানকে একদিন ভুলে যাব। কেন এরকম করলে?'

'আমি নিজেকে বুঝতে পারি না গো। একটা কিছু করার পর বুঝতে পারি এটা ভুল হল। ভেবেছিলাম বাবা-মাকে সুখী করে যাব। ভেবেছিলাম আমার অতীত যদি জানতে পারো তুমি হাত গুটিয়ে নেবে। আমি চট করে ভুলটা করে ফেললাম।' রেণু ওর দিকে তাকাল, 'এই, তুমি অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসনি আর?'

কেউ যেন কুচি কুচি করে দুটো চোখ কেটে দিতে চাইছে, সুমিত চোখ বন্ধ করল, 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি রেণু, জানি না কী আশায় তবু অপেক্ষা করে আছি।'

'আঃ,' কী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল রেণু। তারপর বলল, 'জানো, ও আমার অতীত খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যা যা করেছি সব জেনে যাচ্ছে ও। তোমার কথা জানে না এখনও। তোমার কাছে যদি আসে কখনও—তুমি ফিরিয়ে দেবে তো?'

সুমিত কোনও কথা বলল না। এ কথার কী জবাব দেবে ও।

হঠাৎ রেণু বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক দূরত্ব না?'

সুমিত হাসল, 'আবার কবে আসবে?'

মাথা নাড়ল ও, 'জানি না। হয়তো একেবারে আসব, হয়তো—। এই তুমি ভুলে যেতে পারো না আমাকে!' বড় বড় চোখ তুলে দেখল ও সুমিতকে, 'তুমি খুব ভাল, খুব।'

'তোমাকে ও কি কষ্ট দেয়?' সুমিত জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল রেণু, 'এ সব জিজ্ঞাসা কোরো না তুমি, প্লিজ। আমার ব্যাপার আমি তোমাকে ভাবতে দিতে চাই না। এই তোমার অফিসের ফোন নম্বর আমাকে দেবে?'

দিয়েছিল সুমিত। তারপর রেণু চলে গেল। যাওয়ার সময় খুব ভীত এবং দেরি হয়ে যাওয়ায় ছোট্ট মেয়ের মতো ছটফট করছিল ও। সুমিত বুঝতে পারল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ও এমন করছে। কোনও কথা বলা হল না, অথচ কত কথা যে বলার ছিল!

না, রেণু আর ফোন করেনি। কোনও যোগাযোগ রাখেনি রেণু। এক সময় মনে হয়েছে কী ছেলেমানুষি করছে ও। একটা মেয়ে তার বিবাহিত জীবন ছেড়েছুড়ে কী করে বেরিয়ে আসতে পারে? মনে মনে কতদিন অপেক্ষা করতে পারে ও। আর সেটা কেমন অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে না! কখন কেমন করে মনের মধ্যে দপদপ করা সেই উত্তেজনাটা কমে এল একসময়, তলানির মতো কোনও কোণে চুপচাপ পড়েছিল! হঠাৎ, হঠাৎ কোনও মেয়েকে যার মুখের কোথাও বা হাসির ভাঁজে একটা চেনা ভঙ্গি এসে রেণুকে মনে করিয়ে দিয়ে যায়—এই পর্যন্ত। কিন্তু এটাও তো ঠিক, রেণু যদি সামনে এসে বলে, আমাকে নাও, সুমিতের সাধ্য নেই তা অস্বীকার করে। বুকের মধ্যে ভীষণ তৃষ্ণার্ত কেউ একজন আশায় আশায় বসে থাকে কেন এমন করে!

অথচ চিঠিটা পাবার পর নিজেকে কেমন নিঃস্ব মনে হয়েছিল। একদম বিশ্বাস হয়নি দশপাতার শব্দগুলোকে। মনে হয়েছে নিজেকে আড়াল করার জন্য এভাবে কথার বর্ম পরেছে রেণু। বিয়ে করার সাফাই গাইবার জন্য এত কলঙ্কের অবতারণা। এগুলোকে মিথ্যে প্রমাণ করতে, চিঠির নামগুলো যাচাই করতে যাবে বলে ঠিক করেছিল ও। মনের মধ্যে অবশ্য একটা ভয় উঁকি দিত, যদি ঘটনাগুলো সত্যি হয়ে যায়! কেমন অসহায় লাগত তখন। এক এক সময় মনে হয়েছে এইসব ঘটনাগুলো ভুলে গিয়ে ও স্বচ্ছন্দে রেণুকে গ্রহণ করতে পারে। রেণুর সঙ্গে দেখা করবে ও একাই, এইরকম যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন এক সন্ধ্যায় হোস্টেলে ওর ফোন এল। ফোন ধরতেই শুনল, খুব স্পষ্ট এবং চাপা গলা, 'এই, আমি রেণু!'

খুশিতে ফোনটা আঁকড়ে ধরল ও, 'শোনো, তোমাকে খুঁজেছিলাম আমি, বিশ্বাস করো, তোমাকে

আমার খুব দরকার।'

'তুমি এসো, এখনই, সাতটার মধ্যে।' রেণুর গলাটা এমন কেন?

'কোথায়?' ভাল লাগছিল সুমিতের।

'গড়িয়াহাটের মোড়ে যে বাটার দোকান আছে সেখানে।' রেণু কি ট্রাঙ্ককলে কথা বলছে? গলাটা এত দূরের কেন?

'তুমি কোত্থেকে বলছ?'

'গড়িয়াহাট থেকে।' তারপর শব্দগুলো উচ্চারণ করল ও, 'আজ আমার বিয়ে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল সুমিত, 'কী বলছ?'

'হুঁ লগ্ন সেই ভোর রাতে। আমি চুপচাপ বেরিয়ে এসেছি। তুমি এসো, প্লিজ একবার এসো।' ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল রেণু।

মুহূর্তেই ওপাশে সব থেমে গেল, শুধু যান্ত্রিক শব্দ তুলে ফোনটা কেমন নিঃশব্দ হয়ে গেল। টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এল সুমিত। রেণুর আজ বিয়ে। না, এ হতে দিতে পারে না ও। রেণুকে যদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আজকের রাতটা যদি বাড়িতে ফিরতে না দেয়—বিয়ে ভেঙে যাবে নিশ্চয়ই। জমানো টাকাগুলো পকেটে নিয়ে রাস্তায় নামল ও। এখন ঘড়িতে ছ'টা। একটা বাস পেলে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু বাস নয়, ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল সুমিত। আরও দ্রুত যাবে। সময় নেই।

অনেক কষ্টে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। উঠে বসেই হুকুম করল ঝড়ের মতো চলতে। যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া ডানা মেলে উড়ুক—সুমিত সিটিয়ে বসে থাকল। কিন্তু সামনে এত গাড়ি কেন? কলেজ স্ট্রিট ছেয়ে আছে গাড়িতে গাড়িতে। ড্রাইভার বলল, 'জলুস হ্যায়।' পাগলের মতো উশখুশ করতে লাগল ও। কারা দাবি জানাচ্ছে? কীসের দাবি? এখন ওদের চাহিদা নিশ্চয়ই সুমিতের চেয়ে বেশি নয়—হতে পারে না।

গড়িয়াহাটার বাটার দোকান যখন ও দেখতে পেল তখন পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে সাতটা বেজে। আর খুব স্বাভাবিক ঘটনার মতো রেণু দাঁড়িয়ে নেই। বরং আর একটি মেয়েকে দেখল ও। ওকে কি জিজ্ঞাসা করবে রেণু কোথায় গেছে? ও কি রেণুকে দেখেছে? রেণু নিশ্চয়ই হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে যাবে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে কী এমন ক্ষতি হত রেণু! তোমার জন্য আমি সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারি, তুমি সামান্য পনেরো মিনিট পারলে না! একবুক ভরা বন্ধ বাতাস নিয়ে সুমিত ট্যাক্সি ঘোরাতে বলল। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের দিকে যেতে যেতে রাস্তায় প্রতিটি মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও দেখছিল। এর যে কোনও একজন রেণু হয়ে যেতে পারে। আর তখন দরজা খুলে সুমিত বলবে, 'এসো!' আচ্ছা, আজ বিয়ের দিনে রেণু কোন শাড়ি পরে এসেছিল? রেণু রেণু রেণু। মনে মনে ডাকছিল সুমিত। ডাকার মতো ডাকলে নাকি সব পাওয়া যায়। ওই রাস্তায় এত মেয়ে আছে তবে তারা রেণু নয় কেন? শেষ পর্যন্ত বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে গাড়িটা চলে এল। আর হঠাৎ ও দেখল এক লক্ষ দেওয়ালি নেমে গেছে বাড়িটায়। সানাই বাজছে। আস্তে আস্তে ট্যাক্সিটা বিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে পার হয়ে এল। সানাই-এর চড়া সুর যেন হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে ছুঁড়ে দিলে দূরে—অস্পষ্ট হয়ে গেল বিয়ে বাড়ি।

দু হাতে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল সুমিত। এখন কোথায় যাবে! যদি সোজা বিয়ে বাড়িতে ঢুকে যায়! অসম্ভব। রেণুর সঙ্গে কথা বলা যাবে না কিছুতেই। কিন্তু রেণুকে কী করে বাড়ির বাইরে আনা যায়! বিয়ের কনেকে! হঠাৎ ওর মনে পড়ল ঝুমার কথা। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ঘোরাল ও। এখন যদি ঝুমার কাছে গিয়ে ভিক্ষে করে, ওকে যদি অনুরোধ করে রেণুর বাড়িতে যেতে। একটি মেয়ে এবং রেণুর বন্ধু হিসেবে ঝুমা সহজেই ভেতরে যেতে পারে। গিয়ে বলতে পারে ট্যাক্সি নিয়ে সুমিত ওর জন্য অপেক্ষা করছে, ও চলে আসুক।

ছুটে যাওয়া কলকাতার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে সুমিত বসে থাকল ট্যাক্সির জানালায়।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দিল ও। একগাদা টাকা উঠেছিল মিটারে। কিন্তু সুমিত সেসব খেয়াল করল না। গ্রে স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে মনে করতে চেষ্টা করল ঝুমার বাড়িটা কোন দিকে! আবছা আবছা মনে পড়ছে। অশোক বলেছিল হাতিবাগানে একটা ব্যাঙ্কের ওপর ওদের ফ্ল্যাট। মোড় থেকে একটু এগোতেই ও ব্যাঙ্কটা দেখতে পেল। বাড়িটা দোতলা, তাই অসুবিধে হল না কিছু। সিঁড়ি দিয়ে উঠে

কলিং বেলে আঙুল রাখল ও। হঠাৎ ওর মনে হল এখানে আর কোনও ব্যাঙ্ক নেই তো। যদি ঝুমাদের ফ্ল্যাট এটা না হয়! খুব অসহায়ের মতো সুমিত বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। ভেতরে মৃদু জলতরঙ্গের আওয়াজ উঠেছিল বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর শব্দ না করে দরজা খুলে গেল।

সুমিত দেখল একজন মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতর খুব জোরাল আলো জ্বলছে। চল্লিশের ওপাশে বয়স, তবু মহিলাকে দারুণ দেখাচ্ছে। সুন্দর করে আটসাঁটো শাড়ি পরেছেন উনি। নীলচে কাচের স্টাইলিস ফ্রেমের চশমা গালের ফরসা চামড়ায় একটা আভা ছড়িয়েছে। স্লিভলেশ জামা থেকে বেরিয়ে আসা দুটো ডাঁটো হাত দরজা ধরে রেখেছিল। খুব মৃদু স্বরে উনি বললেন, ' কাকে খুঁজছেন?'

সামান্য হাসবার চেষ্টা করল ও, 'আমি সুমিত, ঝুমা আছে?'

'সুমিট! টেনে টেনে বলল মহিলা। তারপর মাথা নেড়ে ওর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিলেন, 'আসুন।'

সুমিত ঘরে ঢুকতেই দরজা ভেজিয়ে বাঁ হাতে সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললেন, 'একটু বসুন।'

উনি চলে গেলে সুমিত সারা ঘরে ইন্টিমেটের গন্ধ পেল। আঃ, এই গন্ধটা ওর দারুণ লাগে। রেণু ইন্টিমেট মাখে না!

ঘরটা ছিমছাম। পয়সা এবং রুচি থাকলে মানুষ এইভাবে ঘর সাজাতে পারে। পায়ের তলায় ভাঁজ করা পুরু কার্পেট। হাঁটলে আরাম লাগে। এই মহিলা কে? ঝুমার দিদি! যেই হোন না কেন বেশ একটা এয়ার নিয়ে ঘোরেন মহিলা।

পায়ের শব্দে মুখ ঘোরাল ও। এক মুখ হাসি নিয়ে ঝুমা ঘরে এল, 'এই, তুমি! কী সৌভাগ্য আমার, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি।' উঠে দাঁড়িয়েছিল সুমিত। ঝুমাকে দেখে ও একটু চমকে গিয়েছিল। হালকা লাল রঙের হাঁটু অবধি ঝোলা নাইটি পরে আছে ও। মাথার খোলা চুল ফুলে ফেঁপে ঝরনার মতো কাঁধ পিঠ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। শাড়ি পরলে ওকে যেরকম লম্বা দেখায় এখন তা দেখাচ্ছে না। খুব বড় ফুলের তোড়ার মতো জামার হাতা দুটো ডানার কাছে চেপে বসেছে। আর কী আশ্চর্য, ঝুমা ওকে তুমি বলল। এরকম অন্তরঙ্গভাবে কোনওদিন কথা বলেনি ও। নাকি বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছে বলে খুশির ঘোরে তুমি বলল। ঝুমার শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নিল সুমিত, নিজেকে কেমন পাপী পাপী মনে হয়। ও শুনল ঝুমা বলছে, 'মণি, এ হল সুমিত, আমাদের সঙ্গে পড়ে—খুব লাজুক ছেলে, খুব।'

হেসে ফেলল সুমিত। ওকে কেউ লাজুক ছেলে বলেনি কখনও আর ঝুমা পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বোধহয় ওর সম্বন্ধে এই কথাটাই খুঁজে পেল। হাত জোড় করে ঝুমার পেছনে দাঁড়ানো সেই মহিলাকে নমস্কার করল সুমিত। ওঁকে ঝুমা মণি বলে ডাকল। মণি মানে?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। দাঁতের গড়ন ভাল—সুমিত দেখল। ঝুমা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু এবং মা, বুঝলে?'

ঝুমার মা বললেন, 'বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

'না না এখানে বসবে না, চলো আমার ঘরে চলো।' এক হাতে দরজার পরদা ধরে সুমিতকে ডাকল ঝুমা। ঝুমার ঘরে যাওয়া কি শোভনীয় হবে! কিন্তু ও যে সহজ ভঙ্গিতে ডাকছে—সুমিত ওর পেছন পেছন চলে এল। ছোট করিডোর, দুপাশে ঘর। ঝুমার ঘর শেষপ্রান্তে।

ঘরে ঢুকে ঝুমা বলল, 'এখন বলো কী খবর?'

'একটু প্রয়োজন ছিল। সুমিত সোফা-কাম-বেডে হেলান দিয়ে বসল, 'তুমি কেমন আছ?'

'আমি আজ ভীষণ টায়ার্ড! খুব ঘুরেছি। দুপুরে বেরিয়েছিলাম ব্যান্ডেল চার্চ দেখতে, ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে যেতে হল অশোককে সি-অফ করতে।' খাটের ওপর বসে দুটো হাতে দুদিকে ভর দিয়ে মুখ ওপরে তুলে বলল ঝুমা।

'অশোক, অশোক আজ চলে গেল!' কথাটা বলেই মনটা খারাপ হয়ে গেল সুমিতের। ইস, একদম খেয়াল ছিল না। অশোক চলে যাচ্ছে এটা কেমন করে ভুলে গেল ও। ঝুমার দিকে তাকাল সুমিত। অশোকের চলে যাওয়া ওর মনের ওপর কোনও ছাপ ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে না । কী সহজে ও

সি-অফ করতে স্টেশনে গিয়েছিল । ব্যান্ডেল চার্চে কি ও একা যেতে পারে। পাগল! মাথা পেছনে হেলানো, কাঁধদুটো সামান্য উঁচু, হাতের ওপর শরীরের ভর—হালকা নাইটির মধ্যে দিয়ে ওর ভারী বুক পতাকার মতো নড়ছে। ওখানে তো অশোকের জন্য কোনও কষ্ট নেই। নেই?

মাথা নামাল সুমিত। আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল ঝুমা, 'এই তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো এতে?' সুমিত দেখল ঝুমা দু আঙুলে কোমরের কাছ থেকে জামাটা তুলে ধরে ওকে জিজ্ঞাসা করছে।

'না।' বলে সুমিত হাসল। কী বলা যায় আর!

'গুড। বলো প্রয়োজনটা কী!'

একটু উশখুশ করল সুমিত। কীভাবে বলা যায় কথাটা। ঘড়ির দিকে তাকাল, নটা বাজে। ঝুমা বলছে খুব টায়ার্ড। কথাটা ও কীভাবে নেবে। সুমিতের মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করে ঝুমা খাট থেকে নেমে এসে ধপাস করে ওর পাশে বসে পড়ল। একটা পা ভাঁজ করে সোফার ওপর তুলে ওর দিকে ফিরল ঝুমা, 'সিরিয়াস কিছু?'

সুমিত দেখল নাইটি থেকে বেরোনো ঝুমার পুরু পায়ের গোছা কী সাদা আর তাতে নরম সিল্কের মতো ছোট ছোট লোম শুয়ে আছে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল, তাড়াতাড়ি বলে ফেলল ও 'তুমি জানো আজ রেণুর বিয়ে?' কথাটা বলার পর খেয়াল হল ও ঝুমাকে তুমি বলল। বলে ফেলল।

'বিয়ে, ওঃ, তাই নাকি!' কেমন চমকে ওঠা গলায় বলল ঝুমা।

'হুঁ। আমাকে আজ সন্ধের সময় হঠাৎ ফোন করে দেখা করতে বলল রেণু। আমার দেরি হয়েছিল—দেখা পাইনি। আমি কী করব বুঝতে পারছি না ঝুমা। তুমি একবার যাবে? যদি এখনও হয়—আমি বাইরে অপেক্ষা করব—আমি—।' কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সুমিত।

'লগ্ন কখন?' ঝুমা জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল সুমিত, 'বোধহয় ভোরের দিকে।'

হঠাৎ ঝুমা হাত বাড়িয়ে সুমিতের চুলে আঙুল রাখল। ' তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ না? এখন ওখানে যাওয়াটা নেহাতই ছেলেমানুষি, এটা বুঝতে পারছ না?'

'আমি পারছি না।' সুমিতের বুকের মধ্যে সন্ধের পর এই প্রথম একটা কান্না চুপি চুপি বড় হয়ে উঠছিল।

'এই, ছেলেমানুষি কোরো না। দেখছ না রেণু তোমাকে কী সহজে ভুলে গেল। তুমি কেন পারবে না! আর তুমি তো রেণুর প্রথম নও। বোকার মতন মন খারাপ কোরো না। ছিঃ, তুমি তো পুরুষ।' ঝুমার আঙুলগুলো সুমিতের চুলের মধ্যে সাঁতার কাটছে। অন্য হাতে ঝুমা ওর কাঁধ ধরল, 'একদম বাচ্চা ছেলে তুমি। স্পোর্টসম্যান হও। ভাবো না একটা ম্যাচ হেরে গেলে। এই সুমিত—আবার চোখ থেকে জল ফেলছ—ছিঃ। এই বোকা।'

ঝুমার বলার মধ্যে এমন একটা মমতা ছিল, এমন একটা সুর ছিল যাকে মা মা মনে হয়, সুমিত নিজেকে ধরতে রাখতে পারল না আর। ছোট্ট ছেলের মতো ও ঝুমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল। এতদিন বুকের মধ্যে তিল তিল করে জমা পড়েছিল, যা এক নিমেষে কেমন করে তার বাঁধ ভেঙে গেল। ঝুমার বুকে মুখ রেখে ও পবিত্র নদীর মতো ময়লাগুলো ধুয়ে ধুয়ে নিচ্ছিল। দু হাতে সুমিতের মাথাটা বুকে চেপে ধরে ঝুমা ফিসফিস করে বলছিল, 'এই তুমি কাঁদবে না, কেন চোখের জল ফেলছ! আমাকে দ্যাখো না, আমি তো একবারও কাঁদিনি, আমি তো কেমন হাসি মুখে বিদায় দিয়ে এলাম। এই বোকা, তুমি একদম বোকা—আমাকে দ্যাখো না। আমি তো একটা মেয়ে—আমি যদি পারি তবে তুমি পারবে না কেন?' ঝুমার গলাটা কেমন করে এক সময় বুঁজে গেল, ওর ঠোঁট নড়ছিল, সুমিতের মাথার ওপর গাল রেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল ঝুমা।

ঝুমার ওখানে আর যাওয়া হয়নি। এক-একবার মনে হয়েছে গিয়ে দেখা করি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পা আড়ষ্ট হয়েছে, মনের মধ্যে কী সংকোচ চেপে ধরেছে হঠাৎই। আর আশ্চর্যের ব্যাপার ঝুমাও কোনও যোগাযোগ করেনি। যেন সেই রাত্রে হঠাৎই একটা কিছু ঘটে গেল, যা তারপর আর মনে রাখার কোনও

প্রয়োজন নেই। দীপকবাবু কাল রাত্রে বললেন, ঝুমা নাকি রেণুকে কী সব বলেছে। কী বলতে পারে ঝুমা। সেই রাত্রে ও তো কোনও অন্যায় করেনি যা রেণুকে কিছু বলতে পারে। রেণু কি ঝুমাকে ফোন করেছিল! ওকে ফোনে না পেয়ে ঝুমার সঙ্গে কথা বলেছিল? আর সে কথা শুনে রেণু ফিরে গেল বরেনের কাছে? কেমন অসম্ভব লাগছে এরকম ভাবতে—কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য সব কিছুই কি যুক্তিমতন চলে? ঝুমার সঙ্গে কি ও দেখা করে জিজ্ঞাসা করবে? কোনও মানে হয় না।

রেণুর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সুমিত ভেবেছিল ওর ছবি এবং চিঠিগুলো রাখার কোনও যুক্তি নেই—নেহাতই ভার বয়ে বেড়ানো। ঠিক সেই সময় ওর হঠাৎ মনে হল রেণুর চিঠিটা কতদূর সত্যি একবার খোঁজ নিলে হয়। এমনভাবে লিখেছে রেণু, খোঁজ পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। অশোক তখন হায়দরাবাদে, ও সঙ্গে থাকলে ভাল হত। শেষ পর্যন্ত একাই যাওয়া ঠিক করল সুমিত।

প্রথম নাম রমেন রায়। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে এক বিকেলে গিয়ে বিপ্লবের দেখা পেয়ে গেল সুমিত সেই চায়ের দোকানে। সুমিত খুশি হল ছেলেটা ওকে চিনতে পেরেছে। অশোকের কথা বলল সুমিত। তারপর এলোমেলো কথা হওয়ার পর বিপ্লব বলল 'আপনাদের সেই ক্যান্ডিডেটের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জানেন নিশ্চয়ই।'

সুমিত ঘাড় নাড়ল।

'কিন্তু মনে হয় কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে বিয়ের পর। খবর-টবর তো ও বাড়ি থেকে বেরোয় না। তবে আমরা আর মেয়েটাকে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে দেখিনি।' বিপ্লব বলল।

শেষ পর্যন্ত সুমিত জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এখানে রমেন রায় বলে কেউ থাকে?

'রমেন?' চোখ ছোট করল বিপ্লব, 'ওকে চিনলেন কী করে?'

অস্বস্তিতে পড়ল সুমিত, শেষপর্যন্ত বলল, 'শুনেছি রেণুর সঙ্গে নাকি কীসব ছিল ওর।'

হেসে ফেলল বিপ্লব, 'কী মশাই, খুব ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে আপনাকে! রমেনের এখন মিসা হয়ে গেছে।'

বুকের মধ্যে ধক ধক করে উঠল সুমিতের, কথাটা হুবহু মিলে গেল।

বিপ্লব বলল, 'শুনেছি আগে নাকি খুব সোশ্যাল ছিল, পাড়ায় ফাংশন টাংশন করত। রেণুর সঙ্গে বোধহয় বাচ্চাদের আসর করতে গিয়ে ভাবটাব হয়েছিল। একটা ব্যান্ড পার্টি হয়েছিল ক্লাব থেকে। রমেন তার চার্জে ছিল। তারপর একদিন বেপাত্তা হয়ে গেল ও। আমি এ পাড়ায় আসার পর ও আবার ফিরে এল। সে কী ডাঁট তখন রমেনের। মোটর বাইকে করে ঘোরে, জাপাকাপড় দেখলে চোখ বড় হয়ে যাবে আপনার। শেষ পর্যন্ত আমরা খবর পেলাম ও ওয়াগন ব্রেকার পার্টি করেছে। পলিটিক্যাল পার্টিতেও ভিড়েছে। কিন্তু সামলাতে পারেনি, একদিন পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেল, শুনেছি মিসায় আছে।'

আর কিছু দরকার নেই। বিপ্লবের বর্ণনা হুবহু না হোক রমেন রায়ের চরিত্রটা রেণুর চিঠির পাতায় এরকমই হয়ে আছে। রেণু এক ফোঁটা বাড়িয়ে বলেনি। এই ছেলেটিকে কল্পনা করে রেণু মিথ্যে কুৎসার কাদা নিজের গায়ে মেখে চিঠি লেখেনি। ওর পেছনে সবটাই সত্যি হয়ে আছে।

কিন্তু এত কথা জানার পরও রেণু সম্পর্কে কেন খারাপ ভাবনা মনে আসছে না। সব পেয়েছির আসর করতে গিয়ে যে কোনও বাচ্চা তো তাদের নেতাকে নায়ক বলে ভাবতে পারে। অবশ্য তখন কি রেণু বাচ্চা ছিল। রেণু তো স্পষ্ট করে লিখেছে যদিও ফ্রক পরত তবে ও মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের কথা মতন এটাও তো ঠিক, ওয়াগন ব্রেকার রমেন রায়ের সঙ্গে রেণুর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তবে?

রমেন রায়ের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে না ফেলতেই সুমিত সেই উড়োজাহাজ কোম্পানির অফিসটায় গিয়ে হাজির হল। যে সব প্রাইভেট সংস্থা দেশের অভ্যন্তরে যাত্রী পরিবহন করে এদের অবস্থা তাদের মধ্যে সবচেয়ে রমরমে। বিভূতি গাঙ্গুলির খবর পেতে অসুবিধে হল না কিছু। বাড়ির ফোন নম্বরটাও পেয়ে গেল অফিস থেকেই। বিয়ের জন্য মাসখানেক ছুটি নিয়েছে বিভূতি।

অফিস থেকে বেরিয়েই সুমিত একটা পাবলিক বুথে ঢুকে ফোন করল। এখন দুপুর। ওপাশে ফোন বাজছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল কারওর ধরার নাম নেই। বিরক্ত হয়ে রেখে দেবে ভাবছিল এমন সময় ওপাশে একটা ঘুম জড়ানো গলা শুনতে পেল।

'হু ইজ দেয়ার?'

নম্বরটা যাচাই করে নিল সুমিত। হ্যাঁ ঠিক জায়গায় ফোন করেছে ও।

'বিভূতি গাঙ্গুলি আছেন?'

'স্পিকিং।' গলার স্বর কি ঘুমজড়ানো—না মাতাল মাতাল?

'আপনি আমায় চিনবেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সুমিতের গলা একটুও কাঁপল না। সব মিলে যাচ্ছে যে—কী আশ্চর্য!

'বলুন!'

'আপনি রেণুকে চেনেন?'

কোন রেণু? 'হু ইজ শি?' ওপাশের গলায় বিস্ময়।

'রেণু রায়!'

খানিক চুপচাপ, তারপর প্রশ্ন হল, 'আপনি কে?'

'ওর বন্ধু।'

'কী হয়েছে রেণুর?'

'তেমন কিছু নয়। আমি নেহাতই কৌতূহলে আপনাকে ফোন করছি। আপনি ওকে কতটা চেনেন!'

'ভাই এ কথার উত্তর দেব কী করে! আপনাকে আমি চিনি না জানি না, প্লাস, আপনার মুখ দেখতে পাচ্ছি না আমি। ইয়েস ওকে আমি চিনতাম। আর ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভাল মেয়ে। তার বেশি জানবার আগ্রহ যদি থাকে সরাসরি চলে আসুন এখানে। দুপুরবেলায় নয়—এই সময় আমি এবং আমার স্ত্রী খুব ব্যস্ত থাকি, আজ যেমন ছিলাম।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সুমিত, শুনল একটি নারীকণ্ঠ কেমন আবদারে গলায় বলল, 'উম্, প্লিজ বি কুইক!' আর সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল।

ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভাল মেয়ে। কথাটা মনে মনে বলল সুমিত। অর্থাৎ জ্বলজ্যান্ত বিভূতি গাঙ্গুলি, চিঠির পাতায় নন, বাস্তবেও বেঁচেবর্তে আছেন এবং এই মুহূর্তে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যস্ত। ওর মনে হল বিভূতি গাঙ্গুলির কথা বলার মধ্যে কোনও সংকোচ ছিল না, হয়তো ওর স্ত্রী পাশেই, বিছানায় শুয়ে সব শুনেছিল কিন্তু তার জন্যে ও এক ফোঁটা বিব্রত হয়নি। অন্তত ওর গলায় তা মনে হয়নি। অথচ একদিন দিনের পর দিন ও রেণুকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরেছে (রেণুর চিঠি যদি সত্যি হয়)। এবং এখন সুমিতের মনে হচ্ছে তা না হবার কোনও কারণ নেই। এইসব লোক নিজেদের অতীতের কথা বলতে বোধ হয় কোনও দ্বিধা করে না। সুমিতের ভয় হল, ও যদি বিভূতি গাঙ্গুলির বাড়িতে কখনও যায় তা হলে বিভূতি নিজের বউ-এর পাশে বসে রেণুর সব কথা বলে যাবে। আর হয়তো সেইসব কথাগুলো সহজ হবে না, এমনকী রেণু যা লিখেছে তার বাইরের কথাও তো থাকতে পারে যা আরও মারাত্মক চেহারার? অতএব সে সবে না গিয়ে ওর মতো করে বলাই ভাল, ইন এ শর্টকাট, ও খুব ভাল মেয়ে।

পরপর দুটো চরিত্র মিলে যাবার পর সুমিত হাল ছেড়ে দিল। ওর মন এখন বলছে রেণুর চিঠিটা সত্যি, ভীষণ রকমের সত্যি। এই বড় রকমের সত্যি চিঠি রেণু কেন লিখল? নিজেকে এভাবে নগ্ন করে দিতে কোনও মেয়ে চায় কি? বুকের মধ্যে রেণুকে জড়িয়ে ধরে সুমিত একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, এই, আমি তোমার কে? মুখ নামিয়ে চোখ বন্ধ করে রেণু বলেছিল, পতি দেবতা গো! সেই মনের টানে কি চিঠিটা লিখে ফেলেছিল রেণু?

এখন চিঠিটা নিয়ে ও কী করবে? সত্যি কি এর কোনও মূল্য আছে ওর কাছে? না নেই। যাকে ও ভালবাসত তার চেহারা তো ওর কাছে এক এক রকমের হতে পারে না। এ চিঠি নিয়ে ও রেণুর সামনে দাঁড়াতে পারবে না, বলতে পারবে না, দ্যাখো, আমি তোমার সব জানি, তুমি যদি আমার কাছে না ফিরে আসো আমি তোমার সর্বনাশ করব। এ চিঠি দিয়ে ও রেণুর স্বামীকে খুশি করতে পারবে না, দু হাত ভরে সেই ভালবাসার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে না! শুধু কিছু বিশ্রী রকমের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকা চিঠিটাকে বয়ে বেড়িয়ে লাভ কী!

রেণু আজ ফিরে গেছে বরেনের কাছে। অথচ ওর স্বামী নিশ্চয়ই ওর ওপর অত্যাচার করেছে। প্রশ্নটা সেদিন যদিও এড়িয়ে গেছে রেণু কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি একটুও। তবু ফিরে গেল! ওর কি মনে

হয়েছিল সুমিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে? না হলে ও ভাইদের পাঠিয়েছিল কেন এই চিঠি আদায় করতে? কেন ঝুমাকে ফোন করতে গেল। কই, একবারও তো বাপের বাড়ি ফিরে এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারল না! বিশ্বাসের ভিতটা এত সহজে নড়ে গেল কী করে। আবার দীপকের কথা মতন সুমিতের মার খাওয়ার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিল রেণু। কেন?

রেণু, তোমাকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝে আমার মনকেও বুঝতে পারি না, তবু তুমি যখনই যেভাবেই হোক আমার কাছে যদি ফিরে আস তোমাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। রেণু, তুমি আমার রক্তের মধ্যে মিশে গেছ—রক্ত কী করে ধুয়ে ফেলতে হয়? আমি জানি না।

ছবির ফ্রেমের চৌহদ্দিতে সুমিত নিজেকে হাসতে দেখল। হাত বাড়িয়ে ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিল সুমিত। ছবির পেছনেই সেই খামটা। যার মূল্য কারও কাছে অনেক, ওর কাছে কানাকড়িও নয়। এই চিঠিটাও তো রেণুর বিয়ের দিনেই ও ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারত। ও যে ছেঁড়েনি সেটাই বা রেণু বুঝল কী করে। মেয়েরা কী করে এইসব গোপন ইচ্ছার কথা জানতে পারে যা ছেলেরা খুব অবচেতন ভাবে করে যায়। কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে কি না, না দেখেই একটি মেয়ে বলে দিতে পারে। ওর অনুভূতি সে কথা বলতে সাহায্য করে। একটা ছেলেকে এক পলক দেখেই ওরা তার মনের গভীরে সব কিছু ডুবুরির মতো আঁতিপাঁতি করে খুঁজে ফেলে। তা হলে আমাকে তুমি বুঝতে পারলে না কেন?

খাম থেকে ফটো আর চিঠিটা বের করল সুমিত। ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল ও। বন্ধ চোখের পাতায় এখন রেণু। প্রতি রেখা স্পষ্ট, সকালের পুজো পুজো রোদ্দুর, স্নিগ্ধতায় মাখামাখি।

এতদিনের চিঠি, ভাঁজ খুললেই যেন রেণুর হাতের গন্ধ পাওয়া যায়।

'আমার বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ এতক্ষণে, দিনটা এসে গেল বলে। এখন আমার বাড়ির সব ঘরে ব্যস্ততা, যাকে ঘিরে এত আয়োজন তার দিকে তাকাবার সময় নেই কারও। বিয়ের কনে নাকি আমি, এই অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ। (দ্যাখো, কী সহজে এই কথাগুলো লিখে ফেললাম আমি। অথচ তোমরা চলে যাওয়ার পর কতবার শুধু ভেবেছি, আর ভেবেছি)।

কী ভাবছ? আমার সেই কথাগুলো এতদিনে সত্যি হল? সেই যে আমি তোমাকে বলতাম আমি খারাপ, খুব খারাপ। তখন তো তুমি এমন করে তাকাতে যেন আমি খুব ছেলেমানুষ। কি, এখন তো কথাগুলো সত্যি হল? তোমার বিশ্বাস ভুল প্রমাণ করবার জন্য কেমন সত্যি করে ফেললাম।

সুমি, তুমি খুব ভাল। প্রথম দিনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে তুমি খুব ভাল। তোমার জীবনে আমার মতন করে কেউ আসেনি। ভয় হতে লাগল, সেই সঙ্গে লোভ, নিজেকে সামলাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। তোমার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মনে হত তোমাকে সব বলি, খোলামেলা কথা বলে ফেলি, তারপর যা হবার হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় হত, তোমাকে হারাবার ভয়। বিশ্বাস করো, তোমাকে একদিন না দেখলে আমার সবকিছু মিথ্যে হয়ে যেত। আর এখন তো, দ্যাখো কত সহজে তোমাকে যাতে কোনওদিন না দেখতে হয় তার ব্যবস্থায় হাত মিলিয়েছি। বলো, আমি কেমন মেয়ে?

ভালবাসার কাঙাল ছিলাম আমি। এক একজন মানুষেরই রক্তই বোধহয় এরকম হয়। তুমি বলতে আমি নাকি সুন্দর। একথা তো অনেকেই বলত। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কথাটা। শুনতে শুনতে, জানো, বড় অহংকার হত। মনে হত আমি যা চাই তাই পাব। তাই রমেনদা যখন সব মেয়ের মধ্যে আমাকে বিশেষ রকমের খাতির করতে লাগল তখন মনে হয়েছিল এটাই আমার পাওনা। এবং ন্যায্য। রমেনদা আমাকে ভালবাসুক।

অথচ তখন আমার কত বয়সই বা ছিল? এগারো কিংবা বারো। না তার বেশি নয়। (কারণ একটা ব্যাপারে এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখনই আমি ছোট্ট মেয়ে থেকে নারী হয়ে গেলাম একদিন, আচমকা)।

আমাদের পাড়ায় একটা সব পেয়েছির আসর ছিল। বাচ্চাদের খেলাধুলো ড্রিল, এ সব হত। একদিন আমি নাম লেখালাম তাতে। আমার দাদাই বাবার সম্মতি নিয়ে কাণ্ডটা করেছিল। তখন তো আমি নেহাতই বাচ্চা। কিন্তু ওই বয়সেই যে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলাম সেটা হল ছেলেদের চোখ।কোনও ছেলে একবারের বেশি দুবার তাকালে আমরা মেয়েরা তা নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আর আমার মনে হত আমাকে দেখছে। আমি যে একটা দেখার মতো জিনিস (শব্দটা খুব খারাপ)। এটুকু জানতে পেরে

খুব আনন্দ হত গোপনে গোপনে। সবতো পরিষ্কার বুঝতাম না, তবু মনে হত আমি বেশ দামি। ফ্রক পরতাম তখন। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, অল্প বয়সি ছেলেরা যখন তাকাত তখন ওরা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। খারাপ লাগত না আমার। না দেখার ভান করতাম। কিন্তু বড়রা, বিশ্বাস করো, তাদের আমার মতো ছেলেমেয়ে ছিল, আমার পায়ের দিকে কেমন চোখে তাকাত। স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভাল, বেশি রকমের। দশ বারো বছরেই পা দুটো কেমন ভারী ভারী লাগত। ফ্রক পরতাম হাঁটু অবধি। কিন্তু ওই বুড়ো চোখগুলো সেদিকেই তাকিয়ে থাকত। এমন বিশ্রী লাগত না!

আর সেই সময়েই রমেনদাকে দেখলাম। রমেন রায় বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে। দূর থেকে দেখেছি। কৌতূহল হয়নি কিছু। সে বয়সই আমার ছিল না। আসরের দায়িত্ব নিয়ে এল ও। উনিশ কুড়ি বছর বয়স হবে। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বেশ লম্বা, সুন্দর স্বাস্থ্য। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে যখন আমাদের এক্সারসাইজ শেখাত তখন কী ভালই না লাগত। সেই রমেনদা প্রথমদিন আমাকে বলেছিল, 'তুমি কি বাঁশি বাজাতে পারবে? অত সুন্দর ঠোঁট।' কিছু না বুঝে লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলাম। রমেনদার ব্যান্ড পার্টিতে আমি থাকব না, ভাবতেই শরীরটা কেমন করে উঠেছিল। ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, পারব! 'গুড'। হেসে বলেছিল রমেনদা। কথাটা অন্য কোনও মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেনি, শুধু আমাকে। মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম, কী সুন্দর ঠোঁট—কী সুন্দর ঠোঁট। সত্যি এরকম করে তো জানতাম না। বাড়ি ফিরে আয়নায় দেখলাম নিজেকে। মনে হল সত্যি তো আমার ঠোঁটটাকে সুন্দর দেখাচ্ছে! ছেলেরা এমন করে বললে সব কিছু অন্যরকম হয়ে যায় সেই প্রথম টের পেলাম।

আমি বেশি কথা বলতাম না। কেমন লজ্জা করত। কিন্তু রমেনদা যখনই আমাদের বোঝাত তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত। সে, কী করে বিউগল বাজাতে হবে তা থেকে শুরু সব কিছু। যেন আর কেউ সামনে নেই আমি ছাড়া। এমন লজ্জা লাগত না! রাগও হত। সবার সামনে আমার দিকে তাকাবার কী আছে! দু-একজন বন্ধু টের পেয়ে গিয়েছিল বোধহয় একজন বলল, 'রমেনদা তোর লভে পড়েছে।' বিশ্বাস করো কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। লভে পড়লে বুঝি ওরকম করে তাকাতে হয়। তারপর সেই বন্ধু বলল, 'মীরাদি যদি শোনে না তোকে খেয়ে ফেলবে।' আমি বললাম, 'কেন?' ও বলল, 'মীরাদি তো অনেকদিন রমেনদার লভে পড়ে আছে। রমেনদা যে পাত্তা দেয় না।' মীরাদিকে আমি চিনতাম। আমার চেয়ে অনেক বড়। শাড়ি পরে । মুখটা এখন মনে পড়ে না, তবে তোমরা ছেলেরা যা চাও (এই, তোমার কথা বলছি না) সেই বুক ছিল খুব ভারী। বাড়ির লোহার গ্রিলে বুক চেপে রমেনদার ড্রিল করানো দেখত মীরাদি। মীরাদির বুকের দিকে চাইতে আমাদের লজ্জা করত।

না, মীরাদি আমাকে কোনওদিন কিছু বলেনি। বোধহয় শোনেনি কিছু। আমি কিন্তু সেই বন্ধুর কথা শুনে মনে মনে এগিয়ে গেলাম অনেক। অত বড় মীরাদিকে হারিয়ে দিয়ে রমেনদার দৃষ্টি আমার দিকে টানতে পেরেছি বলে একটা অবোধ্য আনন্দ হচ্ছিল। সেই সময় একদিন আমি নারী হয়ে গেলাম। লজ্জায় ভয়ে সে আমার কী কান্না। মা যত বোঝায় এ কিছু নয়, প্রত্যেক মেয়ের এটা হবেই, এটা না হলেই বরং মেয়ে হওয়া যায় না—তত কাঁদি। আসলে বোধহয়, এখন মনে হয়, সেই সময় আমি বুঝে গিয়েছিলাম এখন আমার সবকিছু পালটে যাবে। এখন আমি আর দৌড়ে গিয়ে রমেনদার ড্রিল পার্টিতে দাঁড়াতে পারব না। নিষেধের প্রাচীরটা আচমকা তুলে দিল খানিকটা রক্তপাত। আমাকে বাড়ির জানালায় লোহার শিকে গাল চেপে ওদের দেখতে হবে মীরাদির মতো। আর ব্যাপারটাও হল তাই। আমার আসরে যাওয়া বন্ধ হল। কিন্তু মনে মনে ভীষণ ছটফট করতাম। ভাবতাম রমেনদা নিশ্চয়ই আসবে আমার খোঁজ নিতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আসরের বিকেলবেলায় ড্রিল, ব্যান্ড বাজানো বন্ধ হয়ে গেল কেন? বন্ধুরা খবর দিল, রমেনদার অসুখ হয়েছে। খুব খারাপ লাগতে আরম্ভ করল, শেষ পর্যন্ত একদিন দুপুরে গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। কেমন যেন একটা ভূত আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওখানে। রমেনদার দাদা সন্ন্যাসীগোছের মানুষ, বিয়ে করেনি, আর আছে বুড়ি মা। অতএব আমার অসুবিধে হল না কিছু। গিয়ে দেখি শুয়ে আছে ও, তিন চারদিনের দাড়ি গাল ভর্তি আর কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। আমাকে দেখে হাসল, বুঝলাম খুশি হয়েছে, দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?'

ও আস্তে আস্তে বলল, 'সুখ।'

'সুখ?' আমি বুঝতে পারছিলাম না।

ও বলল, 'তুমি এলে, তাই।'

বিশ্বাস করো, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। জীবনে সেই প্রথম শরীর কেমন করে কদমফুল হয়ে যায় বুঝতে পেরেছিলাম। কাছে ডাকল রমেনদা, 'এতদিন কোথায় ছিলে? আসরে আর আসবে না?'

আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

'কেন?' প্রশ্নটা করেই যেন বুঝতে পেরেছিল রমেনদা, 'পাগল! তাতে কী হয়েছে? তুমি না এলে আমার খারাপ লাগে।' আমি তখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে। রোগা হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে মুখের সামনে ধরল। তখন ওর জ্বর ছিল গায়ে, আমার হাতে গরম ভাব লাগল। হঠাৎ আমার হাত নিজের মুখের ওপর চেপে ধরে চুমু খেল রমেনদা। আর তক্ষুনি আমার মনে হল আমার শরীরের ভিতরে এমন একটা ঘর ছিল যার খবর আমি জানতাম না, এখন এই তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ মুহূর্তেই তার দরজা খুলে দিল। আমি কী সুখে চোখ বন্ধ করে সেই ঘরটাকে দেখছিলাম হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ খুলে দেখি মীরাদি দরজায় দাঁড়িয়ে কেমন করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি, এক দৌড়ে চলে এলাম ওখান থেকে, একেবারে বাড়িতে এসে নিশ্বাস ফেললাম, কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। নিজের কাছেই নিজের কেমন লজ্জা হতে লাগল।

তারপর একদিন শুনলাম পাড়ায় একটা বাজে ছেলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, বালিকা জানে না ও মরে গেছে। সুর করে বলত। কিন্তু এতদিনে আমার শৈশব যে সত্যি সত্যি মরে গেছে, জ্ঞানবৃক্ষের আপেলটা খেয়ে ফেললাম যে। কিন্তু আমাদের আসর আর জমল না। অসুখ সারার পর রমেনদাকে একদিন মাত্র দেখেছিলাম জানলায় বসে। কেমন মায়া লেগেছিল, কথা বলতে পারিনি। তারপর শুনলাম রমেনদা হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। দুঃখ পেয়েছিলাম কি? জানি না। তবে কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জানো, এই ঘটনাটা আমি কখনও ভুলতে পারিনি। জানি, এটা খুব সাধারণ, হয়তো রমেনদার কোনও টান ছিল না আমার ওপর, আমি তো তখন একদম ছেলেমানুষ, তবু ভুলতে পারা গেল না যে কিছুতেই। সেই রমেনদা যখন আমি একদম পুরোপুরি যুবতী মেয়ে, ফিরে এল মোটরসাইকেলে চেপে। সাজগোজে চেনা যায় না। দু-একদিন রাস্তায় দেখা হলে হেসেছে ওই পর্যন্ত। আমি কিন্তু কোনও আকর্ষণ বোধ করিনি ওকে দেখে। সেই চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছিল রমেনদা। শুনলাম পুলিশ নাকি ধরে নিয়ে গেছে ওকে, ওয়াগন ভাঙত। আমার একবিন্দু খারাপ লাগেনি, সত্যি বলছি।

স্কুলে যখন ওপরের ক্লাসে পড়ছি তখন অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টি যাতায়াতের পথে আমি লক্ষ করতাম। কেমন মজা লাগত। নিজেকে অন্য মেয়ের থেকে আলাদা ভাবতে আরম্ভ করলাম। ক্লাসের বন্ধুরা তাদের দাদাদের চিঠি এনে দিত আমার কাছে। একটারও উত্তর দিইনি। ওই বয়সেই কেমন করে বুঝে নিয়েছিলাম আমি খুব দামি।

পড়াশুনায় ভাল ছিলাম চিরকালই। কলেজে উঠে স্বাধীনতা মিলল একা যাওয়া আসার। আর এমনি সময় বিভূতি গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ। আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি মেয়ে, গোলপার্কে থাকে, তাকে লিফট দিতে এসেছিল কলেজের দরজায়। সম্পর্কে ওর আত্মীয় হয়। বন্ধু আমাকে সঙ্গী করল, একই দিকে থাকে বলে উঠে বসলাম গাড়িতে। আলাপ হল। পাইলট অফিসার। চার অঙ্কের মোটা মাইনের মানুষ। অথচ বয়স ত্রিশের নীচেই। দ্বিতীয়বার ডুবলাম।

যেদিন ওর ডিউটি থাকত না সেদিন রাসবিহারীর মোড় থেকে গাড়িতে উঠতাম আমি। ব্যবস্থাটা ইচ্ছে করেই করেছিলাম। গড়িয়াহাটার মোড় অবধি পরিচিত ছেলেদের আনাগোনা বেশি। খবরটা রাষ্ট্র হতে সময় লাগবে না। তার ওপর আর এক উৎপাত শুরু হল। পাড়ার একটা ছেলে সঙ্গ নিতে রোজ। আমি হাঁটতে হাঁটতে মোড় অবধি এসে বাসে উঠতাম। সেও আসত ওই পর্যন্ত কথা বলতে বলতে। প্রথম প্রথম ভেবেছি তাড়িয়ে দেব, দাদাকে বলব বিরক্ত করছে। কিন্তু ভেবে দেখলাম এ এক রকম ভালই হল, ও সঙ্গে থাকলে আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না। কলকাতার রাস্তায় আমার মতো

সুন্দরী মেয়েদের বিপদ অনেক যে। সেই ছেলেটার জন্যে যে আমার মায়া হত। ও আমাকে রোজ বলত সিনেমা দেখার কথা, রেস্টুরেন্টে ঢোকার কথা। আমি হেসে এড়িয়ে যেতাম। তা ধৈর্য ছিল বটে ওর, অনেকদিন আমার প্রহরীর কাজ করে গেছে।

প্রত্যেক মেয়ের একটা এমন বয়স থাকে যখন সে খুব চাকচিক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে যে জীবন আমি কাটিয়েছি তাকে আর যা ইচ্ছা বলি বৈচিত্র্যপূর্ণ বলতে পারব না। সেদিক দিয়ে বিভূতির পাশে বসে ওর গাড়িতে কলকাতা ছাড়িয়ে অনেক দূর দূর যাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ পেতাম। গড়িয়াহাটায় বাসে চেপে রাসবিহারীর মোড়ে নেমে পড়তাম। কোনওদিনই দাঁড়িয়ে থাকতে হত না। সময়ের ব্যাপারে ও ছিল খুব ঠিকঠাক। গাড়িতে উঠে খাতাপত্র ছুঁড়ে দিতাম পেছনের সিটে। তারপর কখনও ডায়মন্ডহারবারের রাস্তায়, কখনও বি টি রোড কখনও হাওড়া ছাড়িয়ে খড়্গপুরের দিকে। এক হাতে গাড়ি চালাত বিভূতি আর অন্য হাতে আমার কোমর চেপে রাখত। গান গাইতে ইচ্ছে হত, কিন্তু মুশকিল হল রবীন্দ্রসংগীত ও একদম পছন্দ করত না। ফলে মুশকিলে পড়ে যেতাম আমি, কাঁহাতক চুপ করে থাকা যায়। মনে মনে গান গেয়ে যেতাম।

আমাদের একটা মজার খেলা ছিল। অনেকদূরে কোনও ফাঁকা মাঠ বা ধানখেতের পাশে গাড়ি দাঁড় করাত বিভূতি। তারপর কাচ তুলে দিয়ে ও আমাকে আদর করত। দু পাশের ধূ-ধূ মাঠ বা ধানের গাছ, আমরা কী নির্জনে আদর করে যাচ্ছি নিজেদের। চুমু খাওয়ার সময় অতবড় মানুষের মুখ কী বাচ্চা দেখায় (রাগ করো না, তোমাকে ঠিক সেরকম দেখাত)। রাস্তায় যে সব গাড়ি চলাচল করত তারা দৃশ্যটা যেটুকু দেখতে পেত হর্ন বাজিয়ে আমাদের জানান দিয়ে যেত। কেয়ার করত না বিভূতি। একদিন দেখি দুটো অবাক হওয়া চোখ গাড়ির কাচে সেঁটে আছে। যেন এত বিস্ময় ও কোনওদিন বোধ করেনি। সরে এসে দেখি একটা বছর সাতেকের বাচ্চা, প্রায় উদোম চেহারা, হাড়-জিরজিরে বুক নিয়ে হাঁপাচ্ছে। দুপাশের ফাঁকা মাঠে ও কেন এসেছিল কে জানে। খুব লজ্জা লেগেছিল। এখানে একটা কথা বলে নিই, যেহেতু আমি মানুষ, বিভূতির শারীরিক সংস্পর্শে এসে অনেক সময় নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। আদর করতে জানত ও, আর সেই সময় নিজের যা কিছু একটা মেয়ের দেবার থাকতে পারে আমি অনায়াসে ওকে দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ও তা নেয়নি। বলেছে, 'এটা থাক। বিয়ের পর তোমার একটা জিনিস একদম নতুন পেতে চাই।' আমার বিশ্বাস, বিভূতি এ সব ব্যাপারে অনেক আগেই অভিজ্ঞ ছিল। মেয়েদের সবরকম গোপনতা ও আবিষ্কার করে ফেলেছিল নিশ্চয়ই। ওভাবে আদর কোনও মানুষ অভিজ্ঞতা না থাকলে করতে পারে না। যেমন তোমাকে আনাড়ি দেখেছি। তা সেইজন্যে হয়তো আমার সবটুকু ও নিতে চায়নি তখনই।

তারপর একদিন ঘটে গেল ব্যাপারটা। একদিন ওর আসার কথা ছিল না, কিন্তু সকাল থেকেই আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বেরিয়ে পড়ি। কলেজ যাবার নাম করে সময়টা কোথাও কাটিয়ে আসি। দুবার ফোন করলাম ওর অফিসে। ওদের অফিসটা ছিল মিশন রোতে। একদিন দেখেছিলাম। দুবার ফোন করে ওকে পেলাম না, ওর ফ্লাইং নেই তবে খুব ব্যস্ত। কিছুতেই শুনলাম না, জোর করতে লাগলাম খুব। অনেক আপত্তির পর শেষ পর্যন্ত ও রাজি হল। বুঝলাম, গলার স্বরে টের পেলাম ওর অস্বস্তি হচ্ছে।

ঠিক দুপুরবেলায় কলেজের সামনে এল গাড়ি নিয়ে। উঠে বসে বললাম ব্যান্ডেল যাব। ও কোনও কথা বলল না। গাড়ি চালাতে লাগল চুপচাপ। এমনকী ফাঁকা জায়গায় এসে আমাকে একবারও আদর করল না। অথচ এটুকুর জন্য ও রোজ ছটফট করত, কখন ফাঁকা জায়গা আসবে! রাগ হয়ে গেল, ওকে গাড়ি থামাতে বললাম। চট করে ব্রেক কষে ও আমার দিকে তাকাতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। আর তখনি আমি টের পেলাম। ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। বিশ্রী গা গুলোনো গন্ধ। ছিটকে সরে এলাম। ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'এই জন্যেই আজ আসতে চাইছিলাম না।' এতক্ষণে রাগে আমার শরীর রি রি করছে। গাড়ি ঘোরাতে বলতেই ও রাজি হল। ভেবেছিল, আমি ঠাণ্ডা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকবার প্রবোধ দেবার, ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করল। রাসবিহারীর মোড়ে আমায় নামিয়ে পরদিন আসবে বলে চলে গেল। কিন্তু আমি আর যাইনি। সেই রাগ সেই গা ঘিন ঘিন ভাবটা কিছুতেই গেল না আমার। আমি যার সঙ্গে

মিশব আমি ছাড়া অন্য কিছু নেশা তার থাকবে ভাবতে গেলেই গা জ্বলে যাচ্ছিল। মাতাল মানে তো আমার কাছে একটাই—ভালবাসা যার নাম। অন্য কিছু আমি সহ্য করতে পারি না যে।

আর আমি ওর সঙ্গে দেখা করিনি। বারবার এসেছে কলেজে, ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কি অন্যায় করেছি? শুনেছি, বন্ধু বলত ও নাকি আরও মদ খাচ্ছে। শুনে ঘেন্নাটা বেড়ে যেত। মাঝে মাঝে ভাবি ওর কোনও যুক্তি নেই, একটা পুরুষমানুষ একদিন মদ খেল কি না খেল তা দিয়ে ভালবাসার বিচার হয় না। এই আমিই তো ছেলেবেলায় দেবদাস পড়ে কেঁদেছিলাম। তা হলে? কী বলব একে, এই অহংকারকে? বলো? আমি খারাপ, খুব খারাপ, তাই এরকম করতে পারলাম, এ ছাড়া আর কী বলতে পারি নিজেকে।

এরপর অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে। কেমন করে বুঝে নিয়েছিলাম, আমি কাউকে ভালবেসে পেতে পারি না। বই-এ পড়তাম একটা মেয়ে জীবনে একবারই ভালবাসে, ভালবেসে মরে, মরে শহীদ হয়ে যায়। দ্বিচারিণী বা বহুকল্পনা শব্দগুলো তো এই সংজ্ঞাকে যে মানে না তাদের জন্যই রাখা হয়েছে। তাই না? রমেনদার পর বিভূতি, আমি অনেক ভেবেছি, একটি মেয়ে সত্যিকারের ভালবাসা ক'বার বাসতে পারে! স্বীকার করছি, রমেনদার ব্যাপারে আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। তবু এখনও রমেনদার সেই জ্বরো মুখটা মনে করলেই বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। কেন? তা হলে আমি বিভূতিকে কী করে ভালবাসলাম? না হলে ও যখন গাড়ির বন্ধ বাতাসে আমাকে আদর করত আমি কেন বার বার সরে সরে যেতাম? কী সুখে? বেশ, বিভূতিকেই আমি আসল ভালবাসা যাকে বলে তাই বেসেছিলাম যদি বলি, দুঃখ পাইনি কেন ছাড়াছাড়ি হবার পর। কেন পাগল হয়ে যাইনি। আমি কি দ্বিচারিণী? জানো, সুমি, আমার বিশ্বাস আমি নিজেকেই ভালবাসতে পারিনি কখনও, আর নিজেকে ভাল না বাসলে অন্যকে ভালবাসা যায় না। তাই না?

এখানেই সব কিছু থেমে থাকতে পারত। বরেন মুখার্জির মতো একজন অফিসার (যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি) আমার জীবনে এসে আমাকে গোটা তিনেক সন্তানের মা করে দিতে পারত নিঃসন্দেহে। শরীর, আমার শরীর। এর সব চাহিদা আমি বুঝি না। পুরুষ বন্ধু ছাড়া কলেজের দিনগুলো তো বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন নতুন অধ্যাপক এলেন। আমাদের পড়াতে। রোগাটে চেহারা, ফরসা, চোখে চশমা। আমার তেমন কিছুই মনে হয়নি। উনি গল্প লেখেন। তরুণ লেখক। 'দেশে' ওর গল্প দেখলাম একদিন। আর এই প্রথম চাক্ষুষ একজন লেখককে দেখলাম। গল্পটার চরিত্রগুলো কেমন বানানো বানানো। ইচ্ছে হচ্ছিল গিয়ে প্রশ্ন করি। তারপরই কৌতূহল বা উৎসাহ ফুরিয়ে যেত আচমকা। ভাল লাগত না কিছু। দেহবাদ সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে একদিন হঠাৎ অধ্যাপক মশাই আধুনিক কবিতায় চলে এলেন। আজকালকার কবি এবং লেখকদের কথা অন্য অধ্যাপকরা সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। যেন উনিশশো চল্লিশের পর আর কিছু লেখা হয়নি। কিন্তু সেদিন উনি যখন আবৃত্তি করলেন, 'অ-আলজিভ চুম্বন করো, শব্দ উঠুক, কাঁপুক ব্রহ্মাণ্ড।' তখন, কী হল জানি না, আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। ক্লাসের অন্য মেয়েরা লজ্জা পাচ্ছে দেখলাম, আমি কিন্তু ভীষণভাবে শব্দগুলোয় ডুব দিয়ে স্নান করলাম। আর সেটা অধ্যাপক লক্ষ করলেন। আমি জানতাম উনি যে কোনও লাইন বলতে শুরু করে শেষ করতেন আমার দিকে তাকিয়ে। এদিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হলেন হয়তো। আর আমার কাছে ওর চেহারাটা একদম অন্য রকমের হয়ে গেল। আমি আবার বোকামি করে ফেললাম।

আলাপ হবার পর জানতে পারলাম উনি আমাদের পাড়ার কাছাকাছি থাকেন। ব্যাচেলার লোক। একটা দু-ঘরের ফ্ল্যাটে, একদম একা। আমরা তিন-চারজন মেয়ে একদিন দল বেঁধে হানা দিলাম ওখানে, পড়া বুঝতে। খুব সুন্দর বোঝাতেন উনি। এমনই যখন কথা বলতেন ভারী ভাল লাগত। কথা বলা যে একটা আর্ট ওর কথা শুনে বুঝলাম আমি। তারপর একা একা যাওয়া শুরু করলাম। প্রথম প্রথম চেয়ারে বসে গল্প আর গল্প। রবীন্দ্রনাথের যে এত ভালবাসার জন ছিল তা আমি জানতাম না। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যে মন দিয়ে নতুন বউঠানকে ভালবাসতেন তা নিয়ে কি মৃণালিনীদেবীকে ভালবাসতেন? মৃণালিনীদেবীর সঙ্গে যখন উনি দাম্পত্য জীবন পালন করতেন তখন কি নতুন বউঠানকে একবারও ভাবতেন? তারপর ওঁর বিজয়া? কিংবা আন্না অথবা নলিনী? এত মানুষকে উনি ভালবাসলেন আর তার

মধ্যে তো কোনও খাদ ছিল না। যখন যার কাছে গেছেন তাকে তো পুরো মনটাই দিয়েছেন। মন কি এঁটো হয়? না কি, উনি বড়, এত বড় যে ওঁর তৃপ্তি ছিল না কিছুতেই। নাকি দুঃখ ওকে অতৃপ্ত করেছিল? আমি তো সাধারণ মেয়ে (তবে সেই কবিতার মতো নয়), তবে আমি কেন এত সহজে বারবার ভালবেসে ফেলি এমন করে।

কিন্তু কবিতায় যা সম্ভব বাস্তবে তো তা হয় না। অধ্যাপক আমাকে যখন চুম্বন করতেন তখন আমার শরীরে পুলক জাগত না কেন? শব্দ হত কিন্তু কেন ব্রহ্মাণ্ড কাঁপত না? কেন ওকে অক্ষম দুর্বল মনে হত? ক্রমশ গা ঘিন ঘিন ভাবটা ফিরে এল মনে। অনেকবার ভেবেছি এ আমারই অক্ষমতা। নিতে না পারার দীনতা। তারপর যেদিন উনি আমার সবটুকু চাইলেন, আমি পালালাম। কেন? আমি তো ওকে বিয়ে করে সংসারজীবন যাপন করতে পারতাম এতদিন। না, আফসোস হয় না একদম, মনে মনে জানি ঠিকই করেছি।

এই সব করে টরে চলে যাচ্ছিল আর কী।

য়ুনিভার্সিটিতে এলাম। আর এসেই তোমাকে দেখলাম। এবার কেউ এসে আমাকে বলেনি ভালবাসি। শুধু চোখের দেখা বুকের মধ্যে এমন করে কীভাবে ঝড় তোলে। কেন বাড়িতে এসে শুতে বসতে পারি না? মনে মনে অনেক ভেবেছি আমি। আমার কাছে পুরুষ মানুষ নতুন নয়। যদিও আলাদা হয় কিন্তু তার পরিণতি তো একই। একটি মেয়ের হাত, মুখ থেকে যার যাত্রা শুরু, বুক হয়ে উরুসন্ধিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার ক্ষান্তি নেই। তবে কেন বার বার সেখানেই ফিরে যাব? তবু কেমন জেদের বসে তোমার সঙ্গে নির্লজ্জর মতো আলাপ করলাম। করেই বুঝলাম তুমি এইজন্যেই যেন জেগে আছ। আর তোমার জীবনে মেয়ে আসেনি আমার আগে। বাড়ি ফিরে এসে খুব কষ্ট হল, ভাবলাম, না আর নয়। তোমার জীবন অশান্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু মনে মনে যে এত লোভ আমার, ভালবাসতে আর ভালবাসা পেতে, আমি পারলাম না। নিজের কাছেই হেরে গেলাম।

ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে গিয়ে তোমার বন্ধুরা যা করেছিল আমরাও তো তা করতে পারতাম। তা হলে আজ আমাকে এমন করে জবাবদিহি দিতে হত না। বিবেকের কাছ থেকে নিস্তার পেতাম। কিন্তু সেদিন বুঝলাম ভালবাসা কারে কয়।

সোনা,,অন্ধকারের যে এত ভালপালা আছে আমি তা জানতাম না। তুমি বলতে, আমি গম্ভীর কেন এত! আমার মনে হত এই একুশ বছরেই আমি খরচ করে ফেলেছি নিজেকে। নিজের বলতে আর এক তিলও বাকি নেই আমার। তোমাকে আমি কী দেব বলো?

বয়েসে তোমার সমান হব আমি, কিন্তু তোমার চেয়ে অভিজ্ঞতায় আমি বয়স্ক। আমাকে এমন করে লোভ দেখিয়ো না তুমি। তোমার সামনে গোটা জীবনটাই পড়ে আছে। জানি একদিন তুমি অনেক বড় হবে। এখনি নিজেকে নষ্ট করবে কেন?

বাবা-মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজেকে বুঝি না বলেই এই প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। আমার ভয় ছিল, যদি তোমার সঙ্গে আগের আগের মতো আমার বিচ্ছেদ হয়ে যায়—সে আমি সইতে পারব না তো।

তুমি এ নিয়ে একদম ভাববে না। (কী বোকার মতো বলছি)। সুমিত, আমার সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগের আঙুল উঁচিয়ো না, প্লিজ। অসাধারণ নাই বা হলে, সাধারণের দলে ভিড় কোরো না, দোহাই।

একটা লোভ মনের মধ্যে মাথা কুটছে। জানতে ইচ্ছে হয়, কতদিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পার, কতদিন? আচ্ছা ধরো, পাঁচ বছর পরে যদি আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তুমি আমায় নিতে পারবে? অপেক্ষা করতে পারবে? ততদিন এই পৃথিবীতে যাই হোক না কেন?

কী জানি কী হয় আমার।

আমি জানি তুমি আমার থাকবে। আমি আমার অন্ধকার ধুয়ে মুছে আসি, লক্ষ্মীটি। আমাকে সুযোগ দাও।

ভাল থেকো বলতে এত কান্না পাচ্ছে কেন গো?

তবু, ভাল থেকো। এই আমি রেণু।'

ভাল আছি, আমি খুব ভাল আছি। হাসতে গিয়ে থমকে গেল সুমিত। ব্যবহারে সব কিছুর ধার কমে যায়। প্রথমদিন এই চিঠি পড়ে বুকের মধ্যে পাক খেয়ে যায়!

কাল রেণু আবার ফিরে গেল বরেনের কাছে। কেন?

এ চিঠি কেন রেখে দিয়েছিলাম আমি? একটা বাড়ি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবার পর তার প্লানটা রেখে দিয়ে কী লাভ হয়! বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফস করে দেশলাই-এর কাঠি জ্বালাল সুমিত। কাগজের একটা কোণ ধরে ফেলল ছোট্ট আগুনটা। তারপর অক্ষরগুলো দুমড়ে মুচড়ে কেমন কালো কালো হয়ে যেতে লাগল। মেঝেতে ফেলে দিল ও পুড়তে থাকা চিঠিটা। তারপর কী মনে হতে ছবিটাকেও আগুনের ওপর উপুড় করে রাখল। গন্ধ বেরুচ্ছে এখন। চোখ পড়ল ওর, জলের মতো বিড়বিড় করে কী উঠছে ছবিটা থেকে? রেণুর মুখ আগুনে উপুড় করে রাখা। চোখ বন্ধ করে শুতে গিয়েই ও কান খাড়া করল। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এসে থামল ওর দরজায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কড়া নড়ে উঠল। কে?

উঠে দাঁড়াল ও খাট থেকে। ধোঁয়া উঠছে পুড়ে যাওয়া চিঠি আর ছবি থেকে। পা দিয়ে ছাইগুলো মাড়িয়ে দিতে লাগল ও। না আগুন নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল ছবিটার একটা কোণ পুরোটা পোড়েনি। হেঁট হয়ে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখল, ধোঁয়াটে কাগজে তিনটে কালো কালো অক্ষর অর্ধেক পোড়া। খুব অস্পষ্ট কিন্তু আন্দাজে পড়ে নেওয়া যায়—এই আমি রেণু।

হঠাৎ সুমিতের মনে হল যেন এইমাত্র একটি শবদাহ হয়ে গেল, আর ও তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিতার আগুন নিভে গেলে জল ঢেলে দেওয়া হয়ে গেলে যে অদ্ভুত শূন্যতা চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে—সুমিত যেন তা টের পাচ্ছিল।

দরজায় আবার শব্দ হল। ভারী পা টেনে টেনে সুমিত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এখন ওর খেয়াল নেই যে ওর হাতের মুঠোর সেই আধপোড়া ছবির টুকরোটা ছাইমাখামাখি হয়ে রয়েছে।

চার

খানিক বাদে বরেন বুঝতে পারল আজ রাত্রে ওর ঘুম আসবে না। এমনিতেই আজকাল ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু আজ অসম্ভব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ও কিছুক্ষণ পায়চারি করল। এখন এ বাড়ি চুপচাপ, এমনকী পাড়াটাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পরিষ্কার একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়া গেল সম্পর্কের—বরেন ব্যাপারটা ভাবল। এত রাত্রে রেণু ফিরে এল, একা, কী ব্যাপার? আর আজ প্রথম ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল, আত্মসমর্পণ করতে চাইল। কেন? এই ব্যাপারটা যদি ফুলশয্যার রাত্রে করত ও, তা হলে এতদিন ধরে বরেনকে এভাবে জ্বলতে হত না, সামনে পড়ে থাকা জীবনটায় অন্ধের মতো হাতড়াতে হত না। হঠাৎ ওর মনে হল, মেয়েটা বোকা। বোকা না হলে এরকম পরিকল্পনাহীন কাজকর্ম করে! জামশেদপুরে প্রথম যেদিন ওকে দেখছিল সেদিন যেভাবে রেণু হেঁটে এসেছিল, যেভাবে অন্যমনস্ক হয়ে পার্কের ফোয়ারাগুলো দেখছিল, বরেন হঠাৎ সেই রেণুকে ভেবে ফেলল।

আশ্চর্য রকমের একটা হার হয়ে গেল ওর। আজ অবধি জীবনের কোনও পরীক্ষাতে হারেনি ও, কর্মজগতে বাধা পায়নি কখনও কিন্তু একটা সামান্য ছেলের কাছে হেরে যেতে হচ্ছে ওকে। যে ছেলের কোনও চালচুলো নেই, মেরুদণ্ড নেই। মেরুদণ্ড থাকলে ও এমন করে রেণুর বিয়েটা হতে দিত না। নাকি এখনও প্রতীক্ষা করে আছে, কবে রেণু ফিরে আসবে? না তা নিশ্চয়ই নয়—তা হলে রেণু আজ এভাবে আত্মসমর্পণ করতে আসত না।

সিগারেটের শেষ হয়ে আসা টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বরেন। বাতাসে অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেল সেটাকে, তারপর রাস্তায় গড়িয়ে যেতে লাগল। এত দূর থেকেও বরেন টুকরোটার মুখে আগুনের ফুলকি উড়তে দেখল। আগুনটা নিভিয়ে ফেললে হত। কিন্তু না, এখন আর ফুলকি উড়ছে না, যে কোনও আগুন একসময় নিভে যায়।

আজ রেণুর চলে যাওয়া মানে চিরকালের জন্য যাওয়া। সারাটা জীবন এখন একা একা কাটাতে

হবে। যদি বিচ্ছেদ আইন মেনে নেয়, যদি রেণু কোনও ক্ষতিপূরণ দাবি নাও করে তা হলে আবার কাউকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার কথা কল্পনা করতে ইচ্ছে হয় না। অন্তত এই বয়সে। এইভাবে হেরে যেতে ওর ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু কী করতে পারে এখন, কী করা যায়।

খুট করে কোথাও একটা শব্দ হল। কেউ যেন দরজার ছিটকিনি খুলল। এই নিস্তব্ধ রাত্রে শব্দটা বেশ জোরেই ওর কানে এল। কিন্তু বোঝা যায় যেই দরজা খুলুক সে চেয়েছিল খুব সন্তর্পণে করতে। সতর্কতার একটা ছাপ রয়েছে শব্দের মধ্যে। এত রাত্রিতে আর কে জেগে আছে? রেণু এসেছে মা বা নীরেন নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু ওরা কেউ একবারও সামনে আসেনি। নীরেনের সঙ্গে ও নিজেকে মেলাতে পারছে না আর। মায়ের ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারেনি ও আজও। মা যেন কেমন একটা দূরত্ব রেখে গেছেন চিরটা কাল। ওর মনে মনে ভয় হয়, শেষ বয়সে এসে বাবা মাকে এমন করে আর একটা সন্তান দিলেন তা বোধহয় মা ক্ষমা করতে পারেননি কোনওকালে। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কেমন ছাড়াছাড়া ছিল। বরেনও মাকে কোনওদিন ঠিক কাছের করে পায়নি। বিয়ে করে যাকে ঘরে নিয়ে এল, সে তো অনেক দূরের মানুষ।

চাপা পায়ের আওয়াজ কানে এল। কেউ যেন খুব সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। শব্দ না করে বাইরের বারান্দায় এল বরেন। ঠাণ্ডা বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে। রেণুর ঘরের এদিকে দরজা খোলাই ছিল, এখনও বন্ধ করেনি। তবে আলো নেভানো। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল বাইরের আবছা আলোয় ঘরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আলো জ্বালল বরেন। না, ঘরে কেউ নেই।

অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল বরেন। রেণু কোথায় গেল? এত রাত্রে। একটু আগে শোনা শব্দ এবং চাপা পায়ের আওয়াজ ওর মনে পড়ল। তা হলে রেণুই কি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এই সময়ে ও কোথায় যাবে? প্রশ্নটা মনে হতেই ওর পায়ের তলা কেমন শিরশির করে উঠল। রেণু যদি পরিচিত কারও কাছে যেত তা হলে নিশ্চয়ই ভোর অবধি অপেক্ষা করত। তা হলে? রেণু কি আত্মহত্যা করতে চাইছে?

ব্যাপারটা ভাবতেই ওর মাথার মধ্যে একসঙ্গে কতগুলো চিন্তা হুড়মুড় করে এসে গেল। রেণু যদি আত্মহত্যা করে তা হলে কী হবে? ওর চাকরি, ওর সম্মান? আঃ। এরকম বোকামি ও কি করবে? হঠাৎ সেই বইটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। গ্রান্ড হোটেলের তলা থেকে কেনা—পয়েজড ফর দ্য কিল। রেণু যদি মারা যায় কেউ বিশ্বাস করবে কি? যদি ওর বিরুদ্ধে কেউ খুনের অভিযোগ আনে? আনতে পারে, খুব সহজেই পারে। ওদের সম্পর্কের কথা কারওর তো অজানা নেই। রেণুর বাড়ির লোক কী ছেড়ে দেবে? তা ছাড়া এ পাড়ার লোকজন বলবে ওরা কী ভাবে দিন কাটাত! বরেনের মনে হল সেই বইটার ছবির মতো, কেউ যেন ওর দিকে ওত পেতে বসে আছে, এখন যে কোনও মুহূর্তেই লাফিয়ে পড়তে পারে।

কাল সকালে আমি একটা বেশ্যার মুখ দেখতে চাই না—এইভাবে কথাগুলো না বললেই হত। অথচ তখন এমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল ও এতটা ভাবেনি। ব্যাপারটা তো অন্যভাবে ট্যাকল করা যেত। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল বরেন। রেণুর ঘরের মধ্যে কোনও চিহ্ন নেই। এ ঘরে কেউ ছিল না, এখন এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বসার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল বরেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে ধক করে উঠল বাইরের দরজাটা হাওয়ায় নড়ছে, সামান্য খোলা।

দ্রুত পায়ে বাইরে এল ও। দরজা খুলে দাঁড়াতেই নজর পড়ল ওপাশের বালকনিতে যেখান থেকে সিঁড়িটা নেমে গেছে নীচে, রেণু দাঁড়িয়ে আছে। আচমকা ওকে পাথরের মূর্তির মতো মনে হল বরেনের। লোহার রেলিং-এ দুহাতের ভর দিয়ে নীচে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে ঝুঁকে আছে ও যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

প্রায় পা টিপে টিপে বরেন রেণুর পেছনে এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেল রেণু, চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে যেন আঁতকে উঠল, তারপর একটা হাতে মুখ চেপে বলে উঠল, 'না-না-না!' ওর চোখ বড় হয়ে উঠেছিল, মৃগী রুগির মতো গোঙাতে লাগল ও। বরেন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল হঠাৎ দেখল, রেণু পড়ে যাচ্ছে।

ওকে ধরে ফেলবার আগেই রেণু মেঝেতে পড়ে গেছে। চাপা গোঙানি বেরুচ্ছিল মুখ থেকে প্রথমটা

তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। কুলকুল করে ঘামতে লাগল বরেন। দুপাশে একবার তাকিয়ে দেখল, না, কেউ জেগে নেই। তারপর চট করে রেণুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল ও।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর মনে হল রেণুর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ এসে ওর শরীরে মাখামাখি হয়ে গেছে। দুটো হাতে, বুকে, যেখানে রেণুর শরীরের ভার ছিল সেখানে অন্য কিছু বোধ করল ও। চট করে বাইরের দরজা বন্ধ করে ফিরে এল বরেন। রেণু তেমনি শুয়ে আছে। মুখটা ওপর করা, লম্বা গলার নীল শিরাগুলো দপ দপ করছে। মুখটা ঈষৎ হাঁ করা তাই দাঁতের সাদাটে অংশ চিক চিক করছে আলোয়।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে কপালের ঘাম মুছল বরেন। ওকে দেখে রেণু ওরকম করে উঠল কেন? ভয় পেয়েছিল এটা ওর ভঙ্গিতে বোঝা গেছে স্পষ্ট। কেন? ও কি ভেবেছিল বরেন ওকে খুন করবে? রেণু কি নার্ভাস অথবা ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, না কি কিছু খেয়েছে? রেণুর বুকের ওপর হাত রাখল বরেন। হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক শব্দ করছে। সব মানুষের হৃৎপিণ্ডই এক শব্দ করে তবে সবার সুখ দুঃখ সমান হয় না কেন? চোরের মতো হাতটা সরিয়ে নিল ও। এখন কি ডাক্তার ডাকা উচিত নয়! যদি জ্ঞান না ফেরে! ও অসহায়ের মতো রেণুর মুখের দিকে তাকাল। স্মেলিং সল্ট নেই বাড়িতে। বরং জল ছিটিয়ে দিলে কাজ হবে। ঘর থেকে বেরতে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের টেবিলের ওপর বইটা খোলা। 'পয়েজড ফর দ্য কিল।' শিরশির করে উঠল ওর শরীর। এ বই কোথা থেকে এল এখানে? কে আনল? দ্রুত এসে বইটা তুলে নিল ও। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোনায়। বইটা কি রেণু পড়েছে? তাই কী ও এমন শিউরে উঠেছিল বরেনকে আচমকা পাশে দেখতে পেয়ে! রেণুর সেই চোখ, হাত চাপা দেওয়া মুখের গোঙানি—বরেন দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ল। ওর এত দিনের সংযম, বয়েস বয়ে আনা অভিজ্ঞতা সব যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আচমকা। দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কেঁদে উঠল বরেন।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল কেউ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তারপরেই ও মাথায় হাতের স্পর্শ পেল।

রেণু ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ পাথরের মতো উদাস, বরেনকে তাকাতে দেখে হাত সরিয়ে নিল। কখন ওর জ্ঞান ফিরেছে কখন ও খাট থেকে উঠে ওকে দেখছে, দেখে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একদম টের পায়নি বরেন।

রেণুর চোখের দিকে তাকাল বরেন। এখন ওর নিজের দৃষ্টি কেমন আবছা, বড় ভারী লাগছে চোখের পাতা। চোখ সরাল না রেণু। কোনও রকম রেখা ফুটল না ওর মুখে। বরেন শুনল রেণু বলছে, 'এখন আমি কী করব?'

আর এই সময় বরেনের মনে হল ওর মতো রেণুও ভীষণ একা। কী নিঃসঙ্গ হয়ে ওরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে অথচ যার পরিণতি কারও কাছে সুখের হবে না। না, আর ও হারতে পারে না। জেতার সুযোগ জীবনে বার বার আসে না।

বরেন উঠে দাঁড়াল, 'তুমি কথা বলো না, তোমার শরীর ঠিক নেই।'

হাসতে চাইল রেণু, 'আমি ভয় পেয়েছিলাম। এত ভয় নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি মুখ দেখাতে চাইনি।'

বরেন কোনও কথা বলল না। চোখ সরিয়ে নিল রেণু, 'এখন কী করব।' নিজের মনে যেন কথাটা বলল ও।

'তুমি আমার কাছে থাকবে। এ ছাড়া মুক্তি নেই,' বরেন বলে ফেলল।

দুটো ঠোঁট চেপে থর থর করে কেঁপে উঠল রেণু, তারপর ধরা গলায় বলল, 'আমার যে একজনের কাছে দায় থেকে গেছে।'

দরজা খুলে সুমিত বলতে যাচ্ছিল কাকে চাই? ওর সামনে যে ভদ্রলোক পাজামা পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছেন তাকে ও চেনে না দ্যাখেওনি কোনওদিন। এই কদিনে এত নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে বাধ্য হচ্ছে ও, এখন বিরক্ত হল। ও প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিল এমন সময় ভদ্রলোক দুটো

হাত জোর করে নমস্কার করলেন। আর এই সময় ওর নজর পড়ল ভদ্রলোকের পেছনে একটু আড়ালে আর একজন দাঁড়িয়ে, যার পরনে হলুদ শাড়ি, চওড়া কপালে গোল করে সিঁদুরের টিপ পরা, সেই চিরকালের ভঙ্গিতে ঘাড় সামান্য বেঁকিয়ে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু কেঁপে উঠল সুমিত। বুকের মধ্যে সেই রবারের বলটা হঠাৎ ড্রপ খেতে আরম্ভ করল।

সুমিত দেখল ভদ্রলোক হাসলেন। লম্বা চেহারার চল্লিশে এসে পড়া বয়েসটা পাকাপাকি জানান দিলেও ভঙ্গিতে একটা সহজ তারুণ্য আছে যা চট করে বোঝা যায়। এই তা হলে রেণুর স্বামী।

নমস্কার করে বরেন বলল, 'আমার নাম বরেন মুখার্জি। আর একে তো চেনেন।'

কী বলবে বুঝতে পারছিল না সুমিত। রেণু ওর স্বামীকে কেন নিয়ে এসেছে? চিঠির জন্য কি? না আরও কোনও অপমান ওর জন্যে অপেক্ষা করছে! রেণুর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল ও। বরেন পরিচয় দিয়ে মুখ ফিরিয়েছিল। দেখল, রেণু কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি কি এসে কোনও অসুবিধে করলাম!' দুটো হাত সামান্য তুলে অপরাধীর মতো ভঙ্গি করল বরেন। 'আমি' শব্দটা লক্ষ করল সুমিত। দুজনে এসেছে অথচ ও আমরা বলল না। সুমিত ঘাড় নেড়ে বলল, 'বলুন কী করতে পারি!'

'করতে তো পারেন মশাই অনেক কিছু!' তবু জোরে জোরে বলল বরেন, 'কিন্তু তার আগে আমাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন তো।'

এক নজর ওদের দেখে নিয়ে সুমিত বলল, 'আসুন।'

প্রায় ওর পেছন পেছন বরেন ঢুকে পড়ল ঘরে। সুমিতের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল, এমনিতে গোছাল নয়, তা ছাড়া দুদিন ধরে ঘরের দিকে একদম নজর দেয়নি ও। জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেডকভারটা পালটানো উচিত ছিল। রেণু ঘরে এল। এসে দরজার পাশে টেবিলটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ওর দুটো হাত সামনে, তাতে একটা ব্যাগ ধরা। বরেন এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

'খুব অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?' বরেন হাসছিল।

'অবাক হবার মতো ব্যাপার নয় কি?' সুমিত বলল।

'না না, তেমন কিছু নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চলে এলাম। আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু। তাই আলাপ করতে চাওয়াটা অন্যায় নয়, কী বলেন?' পকেট থেকে সিগারেট বের করে বরেন সুমিতের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল, ঘাড় নেড়ে সুমিত না বলতে ও বেশ মেজাজ নিয়ে নিজেরটা ধরাল।

খানিকক্ষণ কেউ কথা বলল না। সুমিত টের পেল আবহাওয়াটা কেমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। যদিও এই ভদ্রলোক, রেণুর স্বামী, খুব হাসিখুশি ভাব করছেন তবু কথাগুলো যেন অল্পেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। রেণু কোনও কথা বলেনি ঘরে এসে অবধি। এখন একদৃষ্টিতে দেওয়ালে টাঙানো সুমিতের ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। রেণুর মুখের দিকে ও ভাল করে তাকাতে পারছিল না, বরেন এখন ওকে দেখছে। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে বলে, কেন এসেছ রেণু? এভাবে তুমি আসবে আমি কল্পনাও করতে পারি না যে।

বরেন কেন এসেছে? ও কি কিছু একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়? রেণু এবং নিজের সম্পর্কটা সুমিতকে সামনে রেখে ভেঙে দিতে চায়? মনে মনে তৈরি হয়ে গেল সুমিত, তেমন হলে ও সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেবে। এই রেণু, সামনে যে মুখ তুলে ছবি দেখছে, বরেন সেরকম কিছু করতে চাইলে সানন্দে ওকে গ্রহণ করবে সুমিত। রেণুর কোনও ভুল বা অন্যায় ওর মনের কোথাও ছায়া ফেলছিল না, রেণুর মুখের দিকে তাকালে নিজেকে সম্রাট মনে হয় এখনও। ও ভাবল রেণুকে বসতে বলবে, এখানে, এই খাটে।

'আপনার আজ অফিস নেই?' বরেন কথা বলল।

হাত দিয়ে মুখের ব্যান্ডেজগুলো দেখল সুমিত, 'এভাবে অফিসে যাওয়া কি শোভন হত?'

সোজা হয়ে বসল বরেন, 'সত্যি, এভাবে আপনাকে জড়িয়ে পড়তে হল বলে আমার খারাপ লাগছে। আমি ভাবতেই পারিনি আপনার ওপর শারীরিক টর্চার হবে। আমার বিশ্বাস রেণুও জানত না।'

সুমিত বলল, 'এখন এ সব ভেবে কী হবে! আমার পেছনে তো আপনিও লোক লাগিয়েছিলেন! টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন আমাকে। আপনি কি মনে করেছিলেন টাকা দিয়ে আপনি সব কিছু

করতে পারেন?

বরেন ওকে দেখল, তারপর হেসে ফেলল, 'আপনার অভিযোগ সত্যি।'

'কী চান আপনি?' সুমিত সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল।

কথাটা একটু জোরে হয়ে গিয়েছিল, রেণু মুখ তুলে ওকে দেখল।

মাথা নাড়ল বরেন, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। জানি না কী চিঠি আপনার কাছে আছে—যাই থাক তার দাম নিশ্চয়ই আপনার কাছে অনেক। নইলে তো অল্প টাকায় সে চিঠি আপনি আমার লোককে দিয়ে দিতেন। তাই না? আমি সেই চিঠি নিতে আপনার কাছে আসিনি।'

'তা হলে কেন এসেছেন?' সুমিত বলল।

'সুমিতবাবু, ও চিঠির কোনও দাম আমার কাছে এখন নেই। রেণু আপনাকে যা লিখেছে সে ওর নিজস্ব ব্যাপার—অংশীদার আপনি। আমি আর এ ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না!' বরেন হাসল, 'আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

কী শুনছে ও? সুমিত ঠিক বুঝতে পারছিল না। চিঠিটা হঠাৎ এত মূল্যহীন হয়ে গেল কী করে? ও মেঝেতে পড়ে থাকা ছাইগুলোর দিকে তাকাল। টুকরো টুকরো হয়ে সেগুলো হাওয়ায় ঘরময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বরেনের দিকে তাকাল ও, 'বলুন?'

'আপনি কি এখনও রেণুকে ভালবাসেন?' খুব ধীরে শব্দগুলো উচ্চারণ করল বরেন। করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

এরকম একটা প্রশ্ন বরেন করতে পারে ভাবতে পারেনি সুমিত। ও রেণুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিল। রেণু কোনও কথা বলছে না কেন? রেণু কি বুঝতে পারছে না যে ওর কষ্ট হচ্ছে, এভাবে কিছুক্ষণ চললে ও বরেনকে মেরে বসতে পারে! খাটের ওপর সোজা হয়ে বসল সুমিত, 'কী বলতে চাইছেন?'

'বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। রেণু আমার কাছে বলেছে ওর নাকি আপনার কাছে কী দায় থেকে গেছে। দেখুন, আমি কোনও মেয়েকে ভালবাসার সুযোগ পাইনি। প্রাকটিক্যালি আমি এই বয়েসের আবেগ ঠিক বুঝতেও পারি না।' আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি ওকে দায়মুক্ত করুন।' বরেন উঠে দাঁড়াল।

'না আমার কাছে কারও কোনও দায় নেই। এ আপনি কী বলছেন? যেটা ছিল সেটাও একটু আগে নষ্ট করে ফেলেছি।' আঙুল দিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ছাইগুলো দেখাল সুমিত, 'এখন আপনারা আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।'

কেমন অস্বাভাবিক গলায় বরেন বলল, 'আপনাকে ছাড়া যে আমার, আমাদের চলবে না।'

'মানে?' সুমিত অবাক হয়ে তাকাল।

'আপনি তো রেণুর বন্ধু। বয়েসে যদিও আপনি আমার অনেক ছোট, তবু, তবু আমি আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। আপনার আপত্তি আছে?'

'কেন?'

'সব কেনর কি জবাব দেওয়া যায় মশাই। আমার ইচ্ছে আপনি আমাদের বন্ধু হোন। রেণুকে যদি আপনি ভালবাসেন তা হলে ও যাতে সুখী হয় তাই নিশ্চয়ই চাইবেন? আমি চাই আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসুন। বন্ধুর মতো। রেণু খুশি হবে, আমি ওকে খুশি দেখতে চাই।'

কী একটা বলতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সুমিত। ওর বুকের ভিতর থর থর করে কাঁপছিল। এই লোকটা, হাসি হাসি মুখে কথাগুলো বলছে। কিন্তু তা কি খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে? এর চাইতে যদি সরাসরি ঝগড়া হত তা হলে ও বেঁচে যেত। একটা নতুন ফাঁদে ওকে ফেলার আয়োজন তৈরি হয়ে গেছে।

'কী ভাবছেন এত। সন্ধি করতে হলে তো অনেক কিছু ছাড়তে হয় মশাই। আসুন, হাত বাড়ান।' হাসতে হাসতে একটা হাত বাড়িয়ে দিল বরেন।

সুমিত পাথরের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রেণুর দিকে তাকাল এবার। উড়ে আসা ছাই পায়ে করে চেপে ধরেছে রেণু। গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সেটা। সুমিত দেখল, রেণু কাঁদছে। তারপর সেই কান্নামাখা

মুখ তুলে অদ্ভুত প্রত্যাশা নিয়ে সুমিতের চোখের ওপর চোখ রাখল ও।

মুখ ফেরাল সুমিত। ও দেখল, একটা লোমশ বয়স্ক হাত তার পাঁচটা আঙুল প্রসারিত করে ওর দিকে এগিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল ওর নিজের ডান হাতের মুঠোয় সেই ছবির আধপোড়া টুকরোটা এখনও ধরা রয়েছে। অস্পষ্ট, তবু যেটায় পড়া গিয়েছিল—এই আমি রেণু।

এখন ও কী করবে? অসহায় চোখে ও আবার রেণুর দিকে তাকাল। আর এই সময় হঠাৎ ওর মনে হল, রেণুর এই মুখ, এই চোখ, এই ভঙ্গি—এর আগে কখনও দ্যাখেনি ও।

ডান হাতের মুঠো আলগা করল সুমিত। পোড়া ছাই চেহারা পালটে হাত কালো করে দিয়েছে।

ঈশ্বর! এই চোখে এত জল থাকে কেন?